বিশেষ ডিজিটাল সংস্করণ

জুলাই ২০২০

লিওনার্দো

মৃত্যুর পাঁচশো বছর পরে

ডেভিড হার্ভির প্রবন্ধ

গল্প কবিতা ভ্রমণ লিটল ম্যাগাজিন

নন্দন

৫৫বর্ষ • সপ্তম সংখ্যা • জুলাই ২০২০

লিওনার্দো, মৃত্যুর পাঁচশো বছর পরে

গৌতম সেনগুপ্ত ৫
লিওনার্দো: রেনেসাঁসের বিস্ময় প্রতিভা
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ২৩

প্রবন্ধ

বিকল্প ভাবার এটাই উপযুক্ত মুহূর্ত ডেভিড হার্ভি
অনুবাদ : অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী ৩৯
পূর্ণ চাঁদের মায়া সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় ৮০

স্মরণ

কামালদা পবিত্র সরকার ৭৫

গল্প

বিদেশী পাখি ঋভু চট্টোপাধ্যায় ৬৯

কবিতা

সবর্ণা চট্টোপাধ্যায় বিকাশ চন্দ নাসির ওয়াদেন উৎপল রায়
অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় অনুপ মণ্ডল গোপেশ রায় স্বপ্ননীল রুদ্র
কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী শ্রীনিবাস অধিকারী ৫৭

ভ্রমণ

দেশে দেশে মোর ঘর যশোধরা রায়চৌধুরী ৮৯

লিটল ম্যাগাজিন

সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৭

প্রচ্ছদ : দেবাশিস মিত্র

সম্পাদক : অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী কর্তৃক ৩১, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০১৬ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।
ফোন : ২২১৭ ৬৬৩৩-৪০, ফ্যাক্স : ২২২৬৩৭৮৮ Web : www.nandanpatrika.com

সম্পাদকীয়

বর্তমান ২০২০ সাল হয়তো অনেকরকম দুর্বিপাকের জন্যই ইতিহাসে স্থান পাবে। তার মধ্যে অন্তত দুটি অঘটন কাব্যপ্রেমীদের স্পর্শ করেছে: দু-জন মহাকবির প্রয়াণ। বারবেডোজ-এর কবি এডওয়ার্ড কামাউ ব্র্যাথওয়েট (১৯৩০-২০২০) ফেব্রুয়ারি মাসে এবং নিকারাগুয়ার কবি এর্নেস্তো কার্দেনাল (১৯২৫-২০২০) মার্চ মাসে শেষনিঃশ্বাস ফেলেছেন।

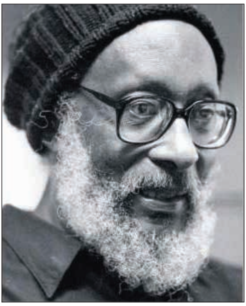

এডওয়ার্ড কামাউ ব্র্যাথওয়েট

মহাকবি আখ্যা তাঁদেরই প্রাপ্য যাঁরা নিজেদের কাব্যকৃতির মাধ্যমে স্বদেশ ও স্বকালকে পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরেন প্রতীক-রূপক-প্রতিমা-চিত্ররূপ-সংকেতের বিচিত্র ঐশ্বর্যময় সহযোগিতায়। এই বৈচিত্র্য সব উল্লেখযোগ্য কবির কবিতাতেই পাওয়া যায়; কিন্তু তাঁরা সবাই দেশকালের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেননি। আলোচ্য দু'জন সেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন এবং তা সম্ভব করে তুলেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের শেখানো ভাষাতেই, কারণ বহু শতাব্দী পূর্বে যা ছিল তাঁদের পূর্ব-প্রজন্মের ভাষা, সে ভাষা লুপ্ত বা প্রবাসে বিস্মৃত। ফলে শ্বেতাঙ্গদের শেখানো ভাষাকে নিজস্ব করে তুলে, তাকে ভেঙেচুরে-তুবড়ে এমন এক নতুন কাব্যভাষা বানালেন ব্র্যাথওয়েট (নাকি 'ব্রাফেট' উচ্চারণটাই বেশি চালু তাঁর দেশে?), যা ক্যারিবিয় নাচগানের ছন্দ-তালকে এনে দিয়েছে কবিতার কাছাকাছি, বারবেডোসের সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি ঢেকে দিয়েছে ইউরোপের ধাঁচকে, যদিচ ভাষাটা ইংরেজি। এই অত্যাশ্চর্য কাব্যবিপ্লব তিনি ঘটালেন উনিশশো ষাটের দশকে প্রকাশিত তিনটি দীর্ঘ কবিতায়। 'রাইটস অব প্যাসেজ' 'মাস্‌ক্‌স্‌' এবং 'আইল্যান্‌ড্‌স' আলাদা আলাদা বই হিসেবে বেরিয়েছিল প্রথমে। পরে যখন তিনটি একসঙ্গে 'অ্যারাইভ্যান্টস' নামে প্রকাশিত হল, তখন বোঝা গেল ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মহাকাব্য রচনাই কবির উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর কাব্যে ভিড় করে এসেছে মৎস্যজীবী, বাগিচাকর্মী, কারখানার মজুর আর দোকানদার। আছে ক্যালিপসো গান, ক্রিকেট আর ধর্ম নিয়ে উন্মাদনা। আছে তারা, যারা শিকড়ের খোঁজে পিতৃপুরুষের

বাসভূমি আফ্রিকায় গিয়েছিল, কাজের খোঁজে ইউরোপে গিয়েছিল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছেন; এবারে আর ক্রীতদাস হয়ে নয়, নিজের সমাজকে নতুন করে গড়ার সংকল্প নিয়ে। সমগ্র পশ্চিম ইন্ডিজের মানুষের পাঁচশো বছরের অভিজ্ঞতাকে কাব্যরূপ দিয়েছেন যিনি, তিনি মহাকবি আখ্যারই যোগ্য। আধুনিক যুগের ইংরেজি কবিতার প্রধান স্রষ্টাদের একজন, আমাদের সিলেবাসে তাঁর স্থান থাকুক বা না থাকুক।

নিকারাগুয়ার মহাকবি এর্নেস্তো কার্দেনাল কেবল কলম হাতে নিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সেই ১৯৪৬ সালে যখন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জনশূন্য নগরী' প্রকাশিত হয়, তখন থেকেই তিনি গণতান্ত্রিক সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশীদার। সামরিক একনায়ক সোমোসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ নিয়ে ১৯৫২ সালে কারারুদ্ধ হন। আবার একটি বিদ্রোহ বিফল হয় ১৯৫৪ সালে। তাতেও তিনি ছিলেন। জেলেই থাকুন আর পালিয়ে বিদেশেই যান, কবিতা লেখা থামাননি। সেই সঙ্গে ধর্মচর্চাও চলছিল। খ্রিস্টিয় ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করলেও কবিতার সংগ্রামী খাঁচ পালটায়নি। তাঁর ধর্ম আর রাজনীতির মধ্যে কবিতা ছিল এক সেতু। ১৯৭০ সালে একটি সাক্ষাৎকারে কার্দেনাল বলেছিলেন, "একটাই বাস্তবকে আমি ভাষা দিয়েছি, যা একই সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অতীন্দ্রিয়।" বস্তুত 'কসমিক ক্যানটিক্ল্' নামক মহাকাব্যে মার্কসবাদ ও ক্যাথলিকবাদের পূর্বতন সংমিশ্রণের সঙ্গে তিনি যোগ করেছেন বিবর্তনবাদকে। বিশ্বচরাচরের বিবর্তন ও বিকাশের পটভূমিকায় তিনি দেখতে চেয়েছেন ল্যাটিন আমেরিকার ইতিহাসকে। একনায়কতন্ত্রের পতনের পর বিপ্লবী সান্দিনিস্তা সরকারের মন্ত্রী ছিলেন আট বছর। যদিও পরে সান্দিনিস্তা দলের সঙ্গে মতভেদ ঘটে।

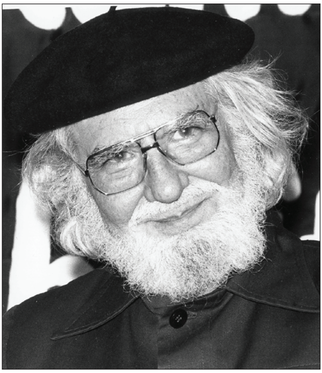

এর্নেস্তো কার্দেনাল

এই দুই মহাকবির মৃত্যুতে বিশ্বসাহিত্য দীনতর হল। তবে তাঁদের অবদান ইংরেজি ও স্প্যানিশ কবিতার ঐতিহ্যে স্থান করে নেবে, তাতে সন্দেহ নেই।

প্রবন্ধ

লিওনার্দো, মৃত্যুর পাঁচশো বছর পরে

গৌতম সেনগুপ্ত

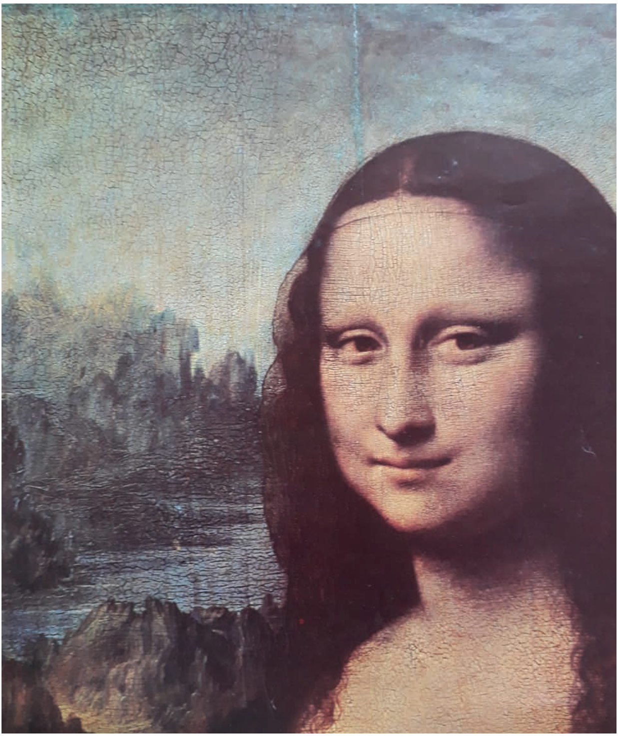

মোনালিসার পশ্চাদপটে স্ফুম্যাটোর ব্যবহার

ছোট বয়স থেকেই নানান বই ও পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত লিওনার্দো দা ভিঞ্চি-র আঁকা ছবি দেখে আসছি। ২০১৮-তে সামনাসামনি লিওনার্দোর সৃষ্টি দেখতে পেলাম ফ্লোরেন্সের উফিজি গ্যালারি, রোমের ভাটিকান ও পারি-র লুভ মিউজিয়মে। প্যালেজ্জো ভেচ্চিও অর্থাৎ ফ্লোরোনেসর

(স্থানীয় উচ্চারণে ফেরেঞ্জে) ষোড়শ শতকের সরকারি দপ্তরের যে বাড়িতে লিওনার্দোর পিতার আইন সংক্রান্ত ব্যবসার অফিস ছিল তার কাছাকাছিই আর্নো নদীর তীরে আছে উফিজি গ্যালারি। নিচের চত্বরে ইতালির (বিশেষ করে ফ্লোরেন্সের) কৃতি সন্তানদের অপূর্ব সব মর্মরমূর্তির মধ্যে একটি লিওনার্দো দা ভিঞ্চির। রেনেসাঁস যুগের পোশাকে সজ্জিত, শ্মশ্রুশোভিত বৃদ্ধ লিওনার্দো দন্ডায়মান। দান্তে, মাইকেলাঞ্জেলো, গ্যালিলিও প্রমুখ মহাজ্ঞানী মহাজনদের মূর্তিও সেখানে আছে। দোতলায় লিওনার্দোর ১৪৭৩-১৪৭৫ সালে আঁকা 'ব্যাপটিজম অফ ক্রাইস্ট' ছবিটি আছে। এ তাঁর বাইশ-তেইশ বছরের সময়কার আঁকা। যদ্দুর জানা যাচ্ছে বইপত্তর ঘেঁটে যে এতে খানিকটা বতিচেল্লিরও তুলির স্পর্শ রয়েছে। কেননা এঁরা দুজনেই কমবয়সে সেকালের ফ্লোরোন্সের চিত্রশিল্পের গুরু আন্দ্রেয়া দেল ভেরাক্কিওর শিক্ষালয়ে কাজ শিখতেন। ছবির বাঁ পাশে হাঁটু মুড়ে বসা তরুণ দেবদূতটির ছবি লিওনার্দো স্বহস্তে করেছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। উফিজি গ্যালারিতে লিওনার্দোর অপর ছবিটি হলো 'অ্যাডোরেশন অব দ্য মেজাই' (১৮৮১-১৪৮২)। এটা কাঠের প্যানেলে তেল রং-এ আঁকা। কাঠের প্যানেলে সে যুগে প্রচুর ছবি আঁকা হতো। চিত্রকলায় ব্যারোক যুগে কাঠের প্যানেলকে পুরোপুরি সরিয়ে জায়গা নেয় ক্যানভাস। বতিচেল্লির 'ভিনাসের জন্ম' বা 'প্রিমাভেরা' – যা উফিজিতেই দেখলাম তাও কাঠের প্যানেলে করা। 'মোনালিসা' ও তো তাই, পপলার কাঠের ওপর আঁকা। 'অ্যাডোরেশন অব দ্য মেজাই' বাদামি মনোক্রমে আঁকছিলেন শিল্পী, কোনো কারণে এটা শেষ করেন নি। তাঁর বহুদিকে ছড়িয়ে থাকা মন হয়তো এই ছবিটি শেষ করার উৎসাহ পায় নি। নানান বৈজ্ঞানিক গবেষণায় হয়তো মন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাঁর আশ্চর্য সঞ্চরণশীল অনুসন্ধিৎসু মনের হদিশ পাওয়া তো প্রায় অসম্ভব। কেবল তাঁর নোটবইগুলো ও পৃথিবীর প্রথম আর্ট হিস্টোরিয়ান জর্জিও ভাসারি-র লেখাগুলো থেকে আমরা এই বিস্ময়কর প্রতিভার খানিকটা আন্দাজ পাবার চেষ্টা করি। সমসাময়িক প্রখ্যাত স্থপতি ও শিল্পী ভাসারি-র 'লাইভস অব দি মোস্ট এমিনেন্ট পেন্টারস, স্কাল্পটারস, অ্যান্ড আরকিটেক্টস'-এর থেকে জানা যায় লিওনার্দো অনিন্দ্যসুন্দর ছিলেন, উজ্জ্বল গোলাপী পোশাক পরতেন, দামি চামড়ার বুট পড়তেন, সোনালি চুল ও দাড়ি ছিল। দুর্দান্ত ঘোড়সওয়ার ও তরোয়াল লড়িয়ে ছিলেন লিওনার্দো।

মাইকেলাঞ্জেলো তাঁকে হিংসে করতেন রূপগুণের জন্য, প্রচুর নিন্দে করতেন ঈর্ষায়। লিওনার্দো যে বিশাল ঘোড়সওয়ারের ব্রোঞ্জ ঢালাইমূর্তি করতে গিয়ে বিফল হয়েছিলেন, তাতে মাইকেলাঞ্জেলো তাঁকে প্রকাশ্যেই উপহাস করতেন। বাজার থেকে প্রচুর পাখি কিনে তাদের খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিতেন ফ্লোরেন্সের আকাশে, চমৎকার লিউট বাজাতে পারতেন, সুকণ্ঠ ছিলেন, আবার দুহাতের চাপে লোহার নাল বেঁকিয়েও দিতে পারতেন। শক্তি, সৌন্দর্য ও মেধার একত্রমিলন হয়েছিল লিওনার্দোর জীবনে।

কাঠের প্যানেলে আঁকা 'অ্যানানসিয়েশন' ছবিটি উফিজি-তে দেখেছি, তা আয়তাকার, ১৪৭২ সালে আঁকা। এতে লিওনার্দো এঁকেছেন দেবদূত এসে বিহ্বলা ভার্জিন মেরীকে জানাচ্ছেন যে তিনি পুত্রবতী হতে চলেছেন। পেছনে কালচে সবুজ গাছগুলি স্যিলুটের মতন। জমিতে ঘাসফুলগুলো যেভাবে আঁকা তা যেন বতিচেল্লির 'প্রিমাভেরা'র মতনই। দূরে একটা অস্পষ্ট পাহাড়। লিওনার্দো তাঁর পরবর্তী বহু বিখ্যাত ছবিতে 'স্ফুম্যাটো' পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এ যেন তারই সূত্রপাত বছর কুড়ি বয়সেই। 'স্ফুম্যাটো' একটি ইতালিয় শব্দ, 'fumo' হলো ধোঁয়াশা—তারই রূপান্তর। 'আর্লি রেনেসাঁস'-এর ফ্লোরেন্টাইন ছবির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল নিখুঁত অঙ্কন, বিজ্ঞানসম্মত আলোছায়ার প্রয়োগ, সঠিক পারসপেক্টিভ, জ্যামিতির ব্যবহার, রং-এর বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ ও লাবণ্যযোজনা। লিওনার্দো তাতে জুড়ে দিলেন তাঁর স্ফুম্যাটো পদ্ধতি। পরে তখন তিনি 'মোনালিসা' বা 'ম্যাডোনা অব দি রকস' আঁকেন, তাতেও ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে তিনি স্ফুম্যাটোর রহস্যময়তা সৃষ্টি করে গেছেন। দা ভিঞ্চি সৃষ্ট এই রহস্যময়তাকে সালভাদোর দালি মনে করতেন অনবদ্য। তিনি দা ভিঞ্চি থেকে তাঁর ছবির রহস্যময়তা সৃষ্টিতে প্রচুর প্রেরণা পেয়েছেন। অনেকেই অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতশিল্পে ষড়ঙ্গ' পড়েছেন। ষড়ঙ্গে চিত্রকলার ছয়রকম গুণ অবশ্যই থাকার কথা বলা হয়েছে। দা ভিঞ্চি বলেছেন দশরকম গুণের কথা। যথা—অন্ধকার, আলোক, ঘনত্ব, বর্ণ, আকার, স্থাননির্দেশ, দূরত্ব, নিকটত্ব, গতি ও স্থিরভাব। চিত্রকলা নিয়ে তাঁর নানান তত্ত্ব নোটবুকে লিখতেন তিনি। ইউরোপের নানান জায়গা থেকে তাঁর নোটবুকের ছ'হাজার পাতা আবিষ্কার হয়েছে। ১৯১৪ সালে বিল গেটস একটা নোটবুক কিনেছিলেন ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার জন্য। বাকি পাতা নানান প্রতিষ্ঠানে রাখা আছে।

লুভে মোনালিসা যে ভাবে দেখেছি

একটা বড় অংশ আছে উইন্ডসর রয়াল লাইব্রেরিতে। নানান রকমের মাপ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ড্রয়িং সমেত লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন তিনবছর বয়সের মানুষ তার পূর্ণবয়স্ক অবস্থার ঠিক অর্ধেক উচ্চতার হয়; কব্জি থেকে সবচেয়ে লম্বা আঙুলের ডগা পর্যন্ত যা মাপ হয় তার চারগুণ হল দীর্ঘ আঙুলের গোড়া থেকে কাঁধ অবধি দূরত্বের মাপ; চার আঙুলের মাপে হয় করতল—চারটে করতলের মাপে পায়ের তলদেশ। চব্বিশটা করতলের মাপে হয় মানুষের দৈর্ঘ্য। দুই হাত ও দুই পা টানটান করে ছড়ালে যে বৃত্ত তৈরি হয় তার ঠিক কেন্দ্রে থাকবে দেহটির নাভি। তখন ব্যাসার্ধ একদম ঠিক হবেই। 'ভিট্রুভিয়ান ম্যান' (১৪৯০) ড্রইং এ এটা এঁকে দেখিয়েছেন, বলতে চেয়েছেন প্রকৃতির সংগতির কথা। অর্থাৎ প্রকৃতিতে সবকিছুই

সুন্দর মাপজোকের বন্দোবস্তে তৈরি। তিনি বিশ্বাস করতেন অঙ্ক জানতে হয় শিল্পীকে। কেননা ছবির মধ্যে অঙ্ক থাকবেই। নোটবুকে এক জায়গায় লিখছেন—শিল্পী মন হল আয়না, জাগতিক বস্তুনিচয় তাতে প্রতিফলিত থাকে। কোথাও মনের ভাবনার কথা লিখেছেন নোটবুকে, 'একথা অকাট্য যে সত্যের সঙ্গে আলোকের যে সম্পর্ক, মিথ্যাচারের সঙ্গে আঁধারের সেই একই সম্পর্ক। দা ভিঞ্চি অন্যত্র লিখেছেন 'যখন তুমি একাকী, তুমি তোমার মনের একচ্ছত্র অধিপতি। কিন্তু যখন তুমি অন্যের সঙ্গে থাকবে তখন অর্ধেক মনের অধিকারী হবে তুমি'।

লিওনার্দো যখন জন্মেছেন তখন মধ্যযুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে। তিনি ফ্লোরেন্সের নবজাগরণের মানুষ। সেই যোড়শ শতকে রিপাবলিক অব ফ্লোরেন্সের শাসক মেদিচি পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প অতি উন্নত স্থান গ্রহণ করেছে। রেনেসাঁসের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন মেদিচি পরিবার। ইউরোপের সর্ববৃহৎ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ছিল তাঁদের। ফ্লোরেন্স শিল্প, সঙ্গীত, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও মানবিকতা চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ফ্লোরেন্স থেকে রেনেসাঁসের আইডিয়া ছড়িয়ে যায় ইতালির অন্যান্য শহরে ও ক্রমে সমগ্র ইউরোপে। হাই রেনেসাঁসের কাল সমাগত প্রায়। সেই হাই রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ কুসুম হলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। হাই রেনেসাঁস শিল্পীদের দিলো মর্যাদা, অর্থকৌলিন্য ও প্রভূত সম্মান। ২০১৯-এ লিওনার্দোর মৃত্যুর পাঁচশো বছর অতিক্রান্ত হল। এই উপলক্ষে পারি-র লুভ মিউজিয়াম লিওনার্দোর জীবন ও তাঁর কীর্তি নিয়ে বিপুল প্রদর্শনীর আয়োজন করে লুভ-এর 'হল নেপলিঁয়'তে। সারা পৃথিবী থেকে ১৬০টি কাজ আনা হয়েছিল (নোটবুকের পাতা সমেত)। ২০০৯ থেকে এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে 'মোনালিসা'কে স্থানান্তরিত করা হয়নি, দেখানো হয়েছে 'ভারচুয়াল রিয়ালিটি এক্সপিরিয়েন্স' পদ্ধতিতে। ফলে এ নিয়ে খুব বিতর্ক উঠেছে। অবশ্য লুভ মিউজিয়াম দেখতে যাঁরা যাবেন তাঁরা অরিজিনাল 'মোনালিসা'কে দর্শন করতে পারবেন। যেমন পেরেছিলাম আমরা। লুভ-এর এই প্রদর্শনী চলে ২০শে অক্টোবর থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারি অবধি। অগণিত মানুষ আগে থেকে টিকিট বুক করে দেখতে গেছেন নিজ নিজ স্লটে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি যখন জন্মেছিলেন তখন ইউরোপের গথিক ও রোমানেস্ক যুগের অবসান হয় নি পুরোপুরি। শ্রী চৈতন্যদেবের চেয়ে লিওনার্দো চৌত্রিশ বছর

আগে ও গুরু নানকের চেয়ে সাতচল্লিশ বছর আগে জন্মান। তিনি বয়সে মাইকেলাঞ্জেলোর থেকে তেইশ বছরের ও রাফায়েলের থেকে একত্রিশ বছরের বড় ছিলেন। মাইকেলাঞ্জেলো তাঁর প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন, কিন্তু রাফায়েল ছিলেন লিওনার্দোর প্রতিভায় মুগ্ধ। তাঁর বহু টেকনিক রাফায়েল আত্মীকরণ করেছেন। লিওনার্দোর জন্মের চল্লিশ বছর বাসে ক্রিস্টোফার কলোম্বাস আটলান্টিক পেরিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজে পৌঁছেছিলেন। লিওনার্দোর যখন ছেচল্লিশ বছর বয়স তখন লিসবন থেকে ভারতের কালিকটে এসে নেমেছিলেন ভাস্কো দা গামা।

ফ্লোরেন্সের উচ্চবিত্ত নোটারি আন্তোনিও-র সম্পত্তি ছিল তাসকানি অঞ্চলের ভিঞ্চি গ্রামে। গম, যব, অলিভ তেল হতো তাদের পারিবারিক ফার্মে। জায়গাটা ফ্লোরেন্স থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূর এখন বাসে করেই যাওয়া যায়, একঘণ্টা মতন লাগে। আন্তোনিও-র যুবক ছেলে সার পিয়ারোও সেই ভিঞ্চি গ্রামে যেতেন। তিনি তখন বাগদত্ত ছিলেন ফ্লোরেন্সের এক নোটারির কন্যার সঙ্গে। তবুও কাতারিনা নামে একটি স্থানীয় মেয়েকে সার পিয়ারো গর্ভবতী করে দেন যৌবনের উদ্বেলতায়। চাষি বা কাঠুরে ঘরের মেয়ে কাতারিনা তাদের গ্রামের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতো। ভিঞ্চি থেকে তিন কিলোমিটার দূরে অ্যানচিয়ানো গ্রামেও সম্পত্তি ছিল আন্তোনিও-র। সেই অ্যানচিয়ানো গ্রামে এক ছোট্ট পাথরের বাড়িতে কাতারিনা তার কানীন পুত্রসন্তানটির জন্ম দেয়। অ্যানচিয়ানোর পাহাড়ি গ্রামে তিন ঘরের পাথুরে বাড়িটি এখনও রয়েছে, টুরিস্টরা দেখতে যান। খুব সাধারণ ঘরদোর, আদ্যিকালের ফায়ার প্লেসও রয়েছে। বাড়ির কোনো ঘরে লিওনার্দো ভূমিষ্ঠ হন তা আজ আর জানার উপায় নেই। তবে শহরের ধুরন্ধর বড়লোকদের কায়দায় শিশুটিকে পরিত্যাগ করেন নি আশি বছরের বৃদ্ধ পিতামহ আন্তোনিও। তাঁর নোটবুকে তিনি লিপিবদ্ধ করছেন—'১৪৫২, ১৫ই এপ্রিল, শনিবার, আমার পুত্র সার পিয়েরোর সন্তান জন্মেছে রাত তিনটের সময়ে। তার নাম রাখা হল লিওনার্দো'। ভিঞ্চি জায়গাটা তো আর আগের মতন নেই। সেখানে লিওনার্দো মিউজিয়ামও হয়েছে এখন। জন্মের পর সামান্য ক'বছর লিওনার্দো মা'র সঙ্গে থেকেছেন। একটু বড় হতে শিশুটিকে ফ্লোরেন্সে দাদুর বাড়ি নিয়ে আসা হয় ও পরিবারের অন্য সব সন্তানদের সঙ্গে সে বড় হতে

থাকে। চার্চে তার নাম নথিভুক্তকরণ হয়। পিতা সার পিয়ারো ধনী নোটারির বাগদত্তা কন্যা অ্যালবিয়েরাকে বিবাহ করেন। ভিঞ্চি গ্রামে লিওনার্দোর মা কাতারিনা অ্যাকাটব্রিগা (যার অর্থ ঝামেলাদার লোক) নামক এক চুল্লি প্রস্তুতকারককে বিয়ে করে নেন ও পরপর পাঁচ সন্তানের মা হন। লিওনার্দোর সঙ্গে ওই পরিবারের খুব একটা যোগ ছিল না, তারা অ্যানচিয়ানো গ্রামের কাছে ক্যাম্পে জেপ্পি গ্রামের ফার্মাহাউসে থাকতো। লিওনার্দো ফ্লোরেন্সে বড় হতে থাকেন। বাবার বদলে দাদু, ঠাকুমা ও এক কাকা ফ্রানসিসকো তাঁকে বেশি দেখাশোনা করেছেন। ড্রয়িং-এ পাকা হাত দেখে সেকালের বিখ্যাত শিল্পী ভাস্কর ভেরাক্কিও-র অঙ্কন শিক্ষালয়ে ভর্তি করা হয় তাঁকে। লিওনার্দোর পিতার প্রথম স্ত্রী মারা গেলে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। দ্বিতীয় সৎ মা ছিলেন মাত্র সতেরো বছরের, লিওনার্দোর চেয়ে এক বছরের বড়। এই বৈধ বিবাহে পুত্রসন্তান জন্মালে অবৈধ সন্তান বলে লিওনার্দোর পারিবারিক সম্পতিতে দাবি শূন্য হয়ে যায় তিনি ছবি তৈরির দোকান খোলেন। ফ্লোরেন্সে শিল্পীদের গিল্ডেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন। জোরাস্ট্রো নামে এক ভৃত্য এইসময় থেকে আমৃত্যু তাঁর সঙ্গে থেকেছে। সে অ্যালকেমি জানতো। লিওনার্দো বিবাহ করেন নি। কমবয়সে সমকামিতার দোষে একবার অভিযুক্তও হয়েছিলেন। তবে তাঁকে দিয়ে অনেকেই কাজ করাতেন বলে হাতে অর্থ আসছিল। ভেরাক্কিও-র স্টুডিওতে থাকাকালীন তিনি শিখেছিলেন ড্রেপারি বা কাপড়চোপড় আঁকা, পারসপেক্টিভ আঁকার নিখুঁত ড্রাফটসম্যানশিপ, ডিমের সাদা অংশ মিশিয়ে টেম্পেরা ছবি তৈরি করা, ক্লে মডেলিং ও লালচকে সাবলীল ড্রয়িং করা। লালচকে বা স্যাঙ্গুইনে ড্রয়িং করা তখন খুব চালু ছিল। লিওনার্দো ছিলেন ambidextrous অর্থাৎ দু'হাতেই সমান লিখতে ও আঁকতে পারতেন। এমন কি তিনি আঁকার জন্য নানান রং এর প্রলেপের কাগজ তৈরি করে নিতেন, যার ওপরে কালিতে বা স্যাঙ্গুইনে কিংবা সিলভার পয়েন্টে ড্রয়িং করতেন। হাইলাইট হিসেবে লাগাতেন সাদা চক, কদাচিৎ তার ওপর ওয়াশের কাজ করতেন।

জীবনের নানান অবস্থায়, দেশের রাজনৈতিক টানাপোড়েনে শিল্পী নানান সময়ে চারবার মিলানে থেকেছেন। মিলান শহরে ট্রাম রাস্তার গায়ে ডোমিনিকান কনভেন্ট সান্টা মারিয়া দেলে গ্রাজি মনাস্টারিটি এখন ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইট, কেননা ওখানেই দেওয়ালে

উফিজির সামনে লিওনার্দোর মূর্তি।

লিওনার্দোর করা বিখ্যাত ‘লাস্ট সাপার’ ম্যুরালটি আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মিত্রবাহিনীর বোমায় এই মনাস্টারির ব্যাপক ক্ষতি হয় যদিও ছবিটি রক্ষা পেয়েছিল। ছবির মাপ প্রায় ৩০ বাই ১৪ ফুট। ছবিটি, সিসটিন চ্যাপেলে করা মাইকেলাঞ্জেলোর বিখ্যাত ফ্রেস্কোর মতন ভিজে পলেস্তারার ওপর আঁকা নয়, যাকে Buon Fresco বলা হয়। শুকনো দেওয়ালে রেজিন ও পিচ মেশানো পলেস্তারার ওপর আঁকা। টেম্পেরার সঙ্গে পরীক্ষামূলক ভাবে তেল রং ও লাগান শিল্পী। সাইপ্রেস ও জুনিপার গাছের থেকে তেলবার করে তাকে বাদাম তেলে মিশিয়ে নতুন ধরনের বার্নিশ তৈরিও করেন। ছবিতে তা লাগাতে ছবির খানিক ক্ষতিও হয়। তাছাড়া দেওয়ালে

ড্যাম্প থাকায় ম্যুরালটি নষ্ট হয়ে যেতে থাকে ক্রমশ। সারাজীবন সব কিছুতেই পরীক্ষানিরীক্ষা করতেন শিল্পী, এখানেও তাই-ই করেছিলেন। ফলে এই ছবি রক্ষণাবেক্ষণে রেস্টোরারদের কালঘাম ছুটে যায়। ছবি শেষ হবার হয়েক বছর পরেই রং-এর চোকলা উঠতে শুরু করেছিল। বলতে গেলে তারপর বারবার ভুল রেস্টোরেশনের ফলে 'লাস্ট সাপার' ছবি এখন বেশ খারাপ হয়ে গেছে। শিল্পীর মূল ছবি থেকে তা পালটেও গেছে বহু অংশে। 'লাস্ট সাপার' এর যে কত প্রিন্ট ও নকল বিক্রি হয় তার কোনো ইয়ত্তা নেই। নানা যুগে বহু খ্যাতনামা শিল্পীই লাস্টসাপার এঁকেছেন, কিন্তু লিওনার্দোরটাই সবচেয়ে পরিচিত।

মিলানে তাঁর জীবনে জোটে সালাই নামে কোঁকড়া চুলের দুষ্ট প্রকৃতির এক সুদর্শন কিশোর। সে ক্রমে বড় হয় ও লিওনার্দোর প্রেমিক রূপে থেকে যায়। এর বেশ কিছু বছর বাদে লিওনার্দো যখন আবার বছর দুয়েক মিলানে বাস করেন তখন ফ্রান্সিসকো মেলজি নামে সম্ভ্রান্তবংশীয় এক তরুণ শিল্পীর শিষ্যরূপে সঙ্গে বাস করতো। মেলজি নিজেও একজন উৎকৃষ্ট চিত্রকর ছিল। সালাই, মেলজি এবং দুজন কাজের লোককে নিয়ে লিওনার্দো ভাটিকানে থেকেছেন। সালাই কোনসময়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মারা যায়। মেলজি লিওনার্দোর অন্তিম সময় পর্যন্ত ছিল। সমকামিতার প্রসঙ্গ মাইকেলাঞ্জেলোর জীবনেও পাওয়া যায়। মাইকেলাঞ্জেলো নীরব, কিন্তু নোটবইতে লিওনার্দো লিখছেন 'অতীত বিষয়ে কখনো মিথ্যাচারী হয়ো না'।

মিলান ছাড়ার পর তিনি ব্যাপকভাবে আল্পস পর্বতমালা ও সন্নিহিত অঞ্চলে ঘোরেন এবং অজস্র ড্রয়িং করেন পার্বত্য প্রকৃতিকে অনুধাবন করার জন্য। মিলান ছাড়াও ইতালির লোম্বার্ডি, মান্তুয়া, রোমান (বোলোনার কাছে) ও রোমে লিওনার্দো থেকেছেন। রোমের ভাটিকান মিউজিয়ামের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ রাফায়েলের অনন্য সব চিত্রকর্ম। ভাটিকানে লিওনার্দোর একটি মাত্র ছবি দেখলাম ১৪৮০ সালে আঁকা সাধু জেরোম-এর ছবি। ছবিটি অসমাপ্ত, কিন্তু খুব ভিড় তা দেখবার জন্য। সন্ত জেরোম নির্জনে এক মঠ বানিয়ে বাস করতেন। একদিন এক আহত সিংহ তাঁর কাছে হাজির হয়। জেরোম তার থাবা থেকে কাঁটা তুলে মলম লাগিয়ে তাকে সারিয়ে তোলেন। সিংহটি তাঁর এত অনুগত হয়ে পড়ে যে সে সাধু জেরোম-এর কাছেই থেকে যায়। লিওনার্দোর ছবিতেও বৃদ্ধ

টাক মাথা জেরোম-এর সামনে সিংহটি মাটিতে বসে আছে দেখা যায়। রাজনৈতিকভাবে ফ্রান্সের কাছে মিলানের পতন হলে শিল্পী কিছুদিনের জন্য ফ্লোরেন্সে ফিরে আসেন। তখন ফ্লোরেন্সে চলেছে খ্রিস্টান মৌলবাদী সাধু সাভানারোলা-র ভয়ানক দাপট। উফিজির কাছে যেখানে সাভানারোলাকে পোড়ানো হয় সে জায়গাটা আমরা দেখেছি। ফ্লোরেন্সে অনেক কাজ পান শিল্পী। ফ্লোরেন্সে সরকারি অফি প্যালেজ্জো ভেচ্চিওর কাউন্সিল চেম্বারে তিনি 'ব্যাটল অফ অ্যানঘিয়ারি' নামে ফ্রেস্কো আঁকার কাজ পান। এই ছবিতে মিলানের ওপর ফ্লোরেন্সের জয় স্মরণ রাখার জন্য কাজের বরাত পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি স্ফোরজা ও বোর্জিয়াদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের স্মৃতিকে রূপ দিচ্ছিলেন। কোনো টেকনিক্যাল ব্যর্থতায় ছবিটি পরিত্যক্ত হয়, তার দায় এসে পড়ে শিল্পীর ঘাড়ে। এই ছবির খসড়াটি লুভ মিউজিয়ামে রাখা আছে। কিছুদিন শক্তিমন্ত সিজার বোর্জিয়ার অধীনেও কাজ করেন সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে। তখন সেতু নির্মাণ করেন ও পিসা থেকে ফ্লোরেন্স পর্যন্ত আর্নো নদীর অভিমুখ ঘুরিয়ে দেবেন বলে ভেবেছিলেন। খাল কাটা হলেও পরিকল্পনাটি সফল হয় নি।

একষট্টি বছরের বৃদ্ধ লিওনার্দো পোপের অধীনে কাজ করতে যান রোমের ভাটিকানে। পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস তখন ভাটিকানকে নবরূপে সাজাচ্ছিলেন। পোপের ভাই ভাটিকান প্রাসাদের অন্তর্গত বেলভেডিয়ার প্যালেসে সবান্ধব লিওনার্দোকে থাকতে দিয়েছিলেন ও মাসোহারা দিতেন। তখন রাফায়েল ছিলেন ভাটিকানের মূল শিল্পী ও পোপের অতি প্রিয় লোক। হাই রেনেসাঁসোর সেই সন্ধিক্ষণে ভাটিকানে কমবয়সী ম্যানারিস্ট শিল্পীরাও কাজ করছেন। লিওনার্দো এই সময়ে প্রায় কিছু ছবি আঁকেন নি। ফুল, লতাপাতা নিয়ে জীববিদ্যার অনুশীলন করতেন, ফুল পাতার ছাঁচ তুলতেন ও বটানিকাল স্টাডির ছবির মতন করে সেগুলো আঁকতেন। এসব দেখেশুনে পোপ অত্যন্ত বিরক্ত হন। তিনি শোনেন লিওনার্দো ঘরে বসে জীবজন্তুদের অ্যানাটমিও আঁকেন। শুধু যন্ত্রপাতি নয়, প্রাণীকুলের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল এবং কমবয়স থেকেই কোনো প্রকার মাংস খেতেন না। ষোড়শ শতকের ইতালিতে নিরামিষভোজী মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। পোপ খবর নিয়ে জানেন লিওনার্দো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নিয়ে লেখালেখি করছেন ও কিভাবে আকাশে ওড়া যায় সে বিষয়ে লিখছেন। সেইসব লেখা না

কী আয়নার সামনে না ধরলে পড়া যায় না। লিওনার্দো তাঁর সমস্ত নোটবইয়ের পাতা ডানদিক থেকে বাঁদিকে লিখে গেছেন। যাতে ৮টি করে কেউ নকল করে নিতে না পারে। মনে হয় তিনি চারপাশে ঘোরা লোকজনদের বিশ্বাস করতেন না। ভাটিকানে অনেকেই এড়িয়ে চলতো ওই রহস্যময় বুড়োকে, তারা ধরে নিয়েছিল বুড়ো ঈশ্বরে ভক্তিমান নয় ও নির্ঘাৎ জাদুবিদ্যাজানে। পোপের ভাই পিউলিয়ানো দে মেদিচি ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও ভক্ত। কিন্তু মাত্র সাঁইত্রিশ বছরে এই একনিষ্ঠ ভক্তটির মৃত্যু হলে শিল্পী আর রোমে থাকতে চান নি। ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস তাঁকে সাদরে ফরাসি দেশের অতিথি হিসাবে থাকার আমন্ত্রণ জানালে ১৫১৬ সালে তিনি রোম ছেড়ে চলে যান। ১৫১৫সালে ফ্রান্সিস ফরাসি দেশের সম্রাট হন। শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। সাম্রাজ্যও বাড়া। ল্যাটিনকে সরিয়ে মান্য ফরাসি ভাষা চালু করেন দেশের সর্বত্র। ফরাসি দেশে ইতালির রেনেসাঁসের আদর্শ নিয়ে যান তিনি। সংগ্রাহক ছিলেন বিপুল ছবির যা আজ লুভ-এ দেখা যায়। তাঁরই সময়ে লুভ মধ্যযুগের দুর্গ থেকে অপূর্ব রেনেসাঁস প্রাসাদে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। পোপ তেমন খাতির না করলেও রাজ্য প্রথম ফ্রান্সিস লিওনার্দোকে সসম্মানে দেশের প্রধানতম চিত্রকর, স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়র পদে বভর করে নেন। প্রায়শই দেখা করতে যেতেন। শিল্পীকে তিনি অস্বাভাবিক প্রতিভাধর জ্ঞান করতেন। পারি থেকে প্রায় দুশো পঁচিশ কিলোমিটার দূরে ল্যুয়া নদীর কাছে অ্যামবয়েস নগরে ক্লো লুস শ্যাতু-তে শিল্পীর সযত্নে থাকার ব্যবস্থা করেন ফরাসি সম্রাট। আর্থিক ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত করে দেন। লিওনার্দো সেখানে সর্বক্ষণ নানান বৈজ্ঞানিক গবেষণার রত ছিলেন। কদাচিৎ সম্রাটকে কোনো স্থাপত্য ডিজাইনের ড্রয়িং বা উৎসব-অনুষ্ঠানের কস্টিউমের ড্রয়িং করে দিয়েছেন। জীবনের শেষদিকে তাঁর ডান হাত অশক্ত হয়ে গেলে বাঁ হাতেই যা করার করতেন। তথাকথিত ডাক্তার দেখাতে ভয় পেতেন তিনি, বিশ্বাস করতেন না তাঁদের ওষুধে। জীবন, মরণ, ফসিল, এসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতেন। যন্ত্রপাতি এবং জ্যামিতি নিয়ে লিখতেন তাঁর নাটবুকে। অ্যামবয়েস-এর প্রাসাদে ১৫১৯-এর ২রা মে রিপাবলিক অব ফ্লোরেন্স তথা ইতালিয় 'রেনেসাঁসের সর্বশ্রেষ্ঠ কুসুম'-এর জীবনাবসান হয় সাতষট্টি বছর বয়সে। মৃত্যুর আগে একটি উইলও করে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধ অবস্থায় লাল স্যাঙ্গুইনে

লিওনার্দোর নোটবুকের পাতা।

অসামান্য আত্মপ্রতিকৃতিও করেছিলেন বাঁ হাতে। নিও-ক্লাসিকাল যুগের অবিস্মরণীয় চিত্রকর জাঁ অগ্যুস্ত-দমিনিক অ্যাঁপ্র ফরাসি সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিসের বাহুবন্ধনে লিওনার্দো মারা যাচ্ছেন—এমন একটি কাল্পনিক ছবি এঁকে গেছেন, যা আছে পারি-র পেতি প্যালেসে ও তার কপি আছে ফ্লোরেন্সের 'অকাদেমিয়া'তে। সেন্ট ফ্লোরেন্টিন চ্যাপেলে আছে লিওনার্দোর সমাধি। সমাধিটি দেওয়াল ঘেঁসে, সাদা পাথরের, তাঁর নাম লেখা কালো অক্ষরে। মাথার দিকে গোলাকৃতি ব্রোঞ্জের প্লাকে বিস্ময়পুরুষটির বাঁদিকের প্রোফাইলের রিলিফ করা। এই রিলিফটি অবশ্য লালচকে আঁকা মেলজি-র ড্রয়িং থেকে নেওয়া। লিওনার্দোর মৃত্যুর পর ওনার নোটবুকের ড্রইং ও রচনার সম্ভার ছিল মেলজির কাছে।

এবারে পারি-র লুভ মিউজিয়ামে রক্ষিত লিওনার্দো দা ভিঞ্চির যেসব ছবি দেখেছি সেগুলোর কথায় আসি। এখানে যে ছবিগুলো আছে তা লিওনার্দোর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁর কাছেই ছিল। শিল্পী

দু'বার এঁকেছিলেন 'ম্যাডোনা অব দি রকস' ছবিটি। দ্বিতীয়বার যেটি আঁকেন তা আছে লন্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারিতে। কাঠের ফলকে তেল রং-এ আঁকা (১৪৮৩-১৪৯০) প্রথম ছবিটা আমরা লুভ-এ দেখলাম। এটির মাথার দিকটি গোলাকৃতি, তাই কারুকার্যখচিত ফ্রেমটিও তদ্রুপ। এখানে একটা আলোছায়া ভরা গুহাতে ভার্জিনের কাছে বসে আছেন শিশু জন ও যিশু। গুহার পেছনদিক দিয়ে আলো আসায় পরিবেশ রহস্যময়। অথচ তা বাস্তবের অনুগামীও নয়। মেরী জনকে ছুঁতে উদ্যত, কিন্তু আপন পুত্রকে নয়, কেননা যিশুর অকালমৃত্যুকে তো মাতা রুখতে পারবেন না, তাই আশিস স্পর্শ দিতে অপারগ। ইতালিয় রেনেসাঁসের যুগে 'Sacra Conversazione' ছিল এক জঁর (genre) যার অর্থ Holy Conversation, যাতে দেখানো হতো ভার্জিন তাঁর শিশুপুত্র যিশুকে নিয়ে বসে, কাছাকাছি অন্য সন্তরা আছেন দাঁড়িয়ে বা হাঁটু গেড়ে। এছাড়া Doner Portrait বা 'Vortive Portrait' আঁকার চল ছিল সেকালে। তাতে যে ধনী বা উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তি ছবিটি খরচা দিয়ে আঁকাচ্ছেন তাঁর বা তাঁর পরিবারের লোকদের (স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বিশেষ করে) ছবিও শিল্পীকে এঁকে দিতে বলতেন ভার্জিন মেরী, যিশু বা সন্তদের ছবির সঙ্গে। বিশেষ করে দেবপ্রতিম চরিত্রদের পায়ের কাছে। তা সাধারণত আঁকা হতো পারসপেক্টিভের যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এই ধরনের ছবি কখনো করেন নি। তিনি নবজাগরণের মূল সুর মানবতার জয়গান করেছেন। ধর্মমূলক ছবিতেও তাঁর আঁকা চরিত্রগুলো অতি মানবিক, স্বাভাবিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা, হতাশার সুরের মধ্যে বাঁধা। সেই অর্থে অলৌকিকও নয়। আর পারসপেক্টিভ ফেলে দেবার কথা তাঁর বৈজ্ঞানিক মনন মানতে পারে নি। লিখে গেছেন তিনি নোটবুকে 'ঘোড়ার যেমন লাগাম, নৌযানের যেমন হাল, তেমনিভাবে পারসপেক্টিভ ছবির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

১৫১৩-১৫১৬ তে শিল্পী আঁকেন 'জন দা ব্যাপটিস্ট'। তা লুভ-এ দেখানো হচ্ছে। এছাড়া ১৫১০-১৫১৪-র মধ্যে এঁকেছিলেন 'বাখাস'। বাখাস গ্রিক পুরানের মদের দেবতা। আশ্চর্য ব্যাপার এই, 'জন' ও 'বাখাস' এর মুখ, নগ্ন দেহ, মেয়েছিল মুখের ছাঁদ, তর্জনীর ভঙ্গিমা প্রায় একই। ১৫১৩ সালে আঁকা 'দি ভার্জিন অ্যান্ড চাইল্ড অ্যান্ড সেন্ট অ্যান' দেখলাম। লুভ-এর এইসব ছবি রেস্টোর করা হয়েছে

লিওনার্দোর ড্রইং, রমনীর মুখ।

বলে তার রং অতি সুন্দর। আগে বইতে ছাপা যে ছবি দেখেছি তার চেয়ে স্বচক্ষে অনেক ঝকঝকে দেখছি। শিশু যিশু এখানে একটি মেষশাবককে ধরে রেখেছেন। মেরী রয়েছেন তাঁর মা সেন্ট অ্যান-এর কোলে। ছবিটির রঙ অতি মনোমুগ্ধকর। ফ্লোরেন্সে টেম্পেরার চল ছিল বেশি। ভেনিসে বেশি চালুছিল তেল রং। কেননা নানান রং এর পিগমেন্ট সেখানে আসতো সমুদ্রপথে ভেনিসের বন্দরে। তা ব্যবহার করতেন শিল্পীরা। লুভ-এ দা ভিঞ্চির ১৪৯০ থেকে ১৪৯৬ সময়কালে কাঠের প্যানেলে তেল রং-এ করা 'লোহাবিক্রেতার মেয়ে ছবিটায় লাল জামা পরা এক চমৎকার রূপসীর মুখোমুখি হতে হয়। ইনি সম্ভবত মিলানের কোন রাজপুরুষের উপস্ত্রী ছিলেন। এটি প্রতিকৃতি রচনার অপূর্ব এক উদাহরণ।

লুভ-এর রিশেলিউ উইং-এর ছ'নম্বর ঘরে রয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত ছবি 'মোনালিসা'। এই ছবিকে বলা হয় প্রথম আধুনিক প্রতিকৃতি, যা সম্ভবত ১৫০৩ আঁকা শুরু হয় ফ্লোরেন্সে। ছবিটা বড়ও তেমন নয়, একত্রিশ বাই একুশ ইঞ্চি মাপের সাদা পপলার কাঠের তক্তার

ওপর তেল রং-এ আঁকা। ‘মোনালিসার’ সামনে বিশাল ভিড়, যেমন আমরা নামকরা কোনো প্যান্ডেলের দুর্গা প্রতিমার সামনে দেখি। গাদা গাদা ছবি উঠছে, সেলফি তুলছে লোকে। তবে ‘মোনালিসা’র কাছে যাবার কোনো উপায় নেই। দড়ির বেড়া, এরপর কাঠের বেড়া, তারপর বুলেটপ্রুফ কাচে ওপাশ থেকে স্মিত হাসছেন ‘মোনালিসা’। চারজন রক্ষী সতর্ক দৃষ্টি মেলে লক্ষ্যও রাখছেন। ‘মোনালিসা’র ইতালিয় নাম জ্যাকেন্দা। ফ্লোরেন্সের সিল্ক ব্যবসায়ী ফ্রানসিসকো বার্থোলোমিউ দেল জিওকোন্দোর তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন ওই মহিলা। ছবিটা আঁকার সময়ে লিওনার্দোর বয়স ছল একান্ন। ছবিটা আঁকতে প্রায় বছর চারেক সময় নিয়েছিলেন শিল্পী, আর কোনোদিন ছবিটা কাছ ছাড়া করেন নি মৃত্যু পর্যন্ত। ১৫১৯-এ শিল্পীর মৃত্যু হলে ছবির মালিক হয়ে দাঁড়ান ফরাসি সম্রাটরাই। ছবিটি থেকে প্রায় লুভ-এ। অবশ্য ১৮০০ সাল থেকে বছর চারেক ‘মোনালিসা’কে লুভ থেকে নিজের প্রাসাদে এনে রাখেন সম্রাট নেপলিঁয়। ক্রমে এ ছবির খ্যাতি বাড়ে আর্ট রসিকদের একের পর কে লেখায়। মোনালিসাকে নিয়ে রচিত হয় উপন্যাস, কবিতা, নাটক, সঙ্গীত, কার্টুন, রহস্যকাহিনী। এর সঙ্গে বিজ্ঞাপনের বিচিত্র কৌশলে, মিডিয়া ও মার্কেটিং-এর অবদানও চরম হতে হতে ‘মোনালিসা’কে পশ্চিমী দুনিয়ার এক আইকনে পরিণত করে দিয়েছে এবং অবধারিতভাবে ক্লিশেতেও বটে। ‘মোনালিসা’র হাসি রহস্যময়, তার যে কত ব্যাখ্যা ও কত গবেষণা তার ইয়ত্তা নেই, যা এখনো শেষ হয় নি। বতিচেল্লির ‘ভিনাস’ এর মতন নয় ‘মোনালিসা’র দৃষ্টি সে চেয়ে আছে দর্শকের দিকে সরাসরি। তার চোখের মণি ঈষৎ খয়েরি, ভ্রুযুগল কামানো। তখনকার দিনে ভ্রু তুলে ফেলাই ছিল ফ্যাশন। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডে পাহাড়, গিরিখাত, সরু রাস্তা, জলের আভাস সবই লিওনার্দোর স্কুম্যাটোয় আচ্ছন্ন। তবে যে হালকা কালচে সবজে রং এই ছবির মূল টোনালিটি বলে পরিচিত, তা কালের প্রকোপে হয়েছে। যখন শিল্পী এঁকেছিলেন তখন হয়তো মেন ছিল না। রেনেসাঁসের যুগে ব্যক্তি মানুষের প্রতিকৃতি করার চল এসেছিল। সেই সঙ্গে এসেছি সেকুলার পেন্টিং-এর প্রচলন। এই সেকুলার-এর অর্থ হল যা ধর্মের সঙ্গে সংযোজিত নয়। ‘মোনালিসা’ আঁকা হয়েছিল সেই যুগের হাওয়ার ফলেই। রাফায়েল থেকে শুরু করে কত শিল্পী যে কপি করেছেন মোনালিসার। কলম্বিয়ার ফারনান্দো বোটেরো pastiche

ধরণে এঁকেছেন বস্তার মতন মোটকা মোনালিসা। ফ্রান্সের মার্শাল দ্যুঁশা মোনালিসাকে দিয়েছেন ছাগলদাড়ি ও ওপরদিকে ঠেলে ওঠা সরু গোঁফ এবং ডাডাইস্ট কায়দায় অশ্লীল ইঙ্গিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন শিল্পী অ্যান্ডি ওঅরহোল মোনালিসা নিয়ে বিচিত্র কাজ করেন স্ক্রিন পেন্টিং-এ। কত দেশ পোস্টেজ স্ট্যাম্প বার করেছেন মোনালিসার। 'মোনালিসা' এখন এক দ্রষ্টব্য, শুধু বুঝি শিল্পকর্ম নয়। পারি গেলে অনেকেই সময় বাঁচিয়ে যা হোক তা হোক করে 'মোনালিসা' দেখে আসেন। সব মিলিয়ে 'মোনালিসা' যেন এক মিথ হয়ে গেছে ইতিহাসে। সে মিথ বিস্ময়কর রকমের 'সেকুলার মিথ'। আধুনিক চিত্রকলার দুই দিকপাল চিত্রকর পাবলো পিকাসো ও সালভাদোর দালি লিওনার্দোকে খুবই সম্মান করতেন। বামপন্থী পিকাসো-র চোখেই হোক আর মিস্টিক সুররিয়ালিস্ট দালি-র চোখেই হোক লিওনার্দোর প্রতিভা ও কল্পনাশক্তি এক পরম শ্রদ্ধার বিষয়। বিজ্ঞানমনস্ক দা ভিঞ্চি-কে নিয়েও আলোচনা সীমাহীন। তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ছবি দেখতে তাঁকে আমাদের সমকালীন বলেই মনে হয়। জাঁ ঝাক রুশো যেমন বলতেন—উত্তরটা বড় কথা নয়, প্রশ্নটাই বড় কথা, লিওনার্দোর জীবনজিজ্ঞাসাও সেই কথা বলে। মিলানের ডিউক লুদভিকো স্ফোর্জার কাছে তিনি কী কী পারেন তার ফিরিস্তি দিয়ে চাকরির দরখাস্ত করেছিলেন লিওনার্দো। তা সংক্ষেপে এই—

১) হালকা, মজবুত, সহজে বহনযোগ্য সেতু নির্মাণ, ২) অগ্নি নিরোধক ভারি ধরনের সেতু তৈরি, ৩) আক্রমণের সময়ে পরিখা জলশূন্য করা, ৪) বিশেষ ধরনের সিঁড়ি নির্মাণ যা প্রয়োজন মতন মাপে বড ও আগুপিছু করা যাবে, ৫) উঁচু জায়গাতে গোলা ছোঁড়ার উপযুক্ত যন্ত্র তৈরি, ৬) সহজে বহনযোগ্য হালকা কামান তৈরি, ৭) গোলা ছুঁড়ে শত্রুর দৃষ্টিপথ আচ্ছন্নকারী ধোঁয়া সৃষ্টি, ৮) নদী বা ভূমির তলদেশ দিয়ে নিঃশব্দে আঁকা বাঁকা পথ তৈরি, ৯) পদাতিক সৈন্যদের পথ দেখানোর জন্য ধাতুপাতে ঢাকা চক্রযান নির্মাণ, ১০) অগ্নিনিরোধক রণতরী নির্মাণ, ১১) ধাতু ও মার্বেলের মূর্তি গঠন ও চিত্রাঙ্কন।

মিলানের ডিউকের কাছে চাকরিটা তিনি পেয়েছিলেন সামরিক ইঞ্জিনিয়ার রূপে। অবশ্য স্ফোর্জা তাঁর লিউট বাদনেরও খুব ভক্ত ছিলেন। ফ্লোরেন্সের মেদিচিদের মতন স্ফোর্জারা ছিলেন মিলানের

নবজাগরণের পৃষ্ঠপোষক। লিওনার্দো হেলিকপ্টার, প্যারাশ্যুট, সাঁজোয়া গাড়ি, মেশিনগান, সাবমেরিন, স্কুবা ডাইভিং-এর উপযোগী সুইমস্যুট এবং চারচাকার স্বয়ংক্রিয় যানের পরিকল্পনা করেছিলেন। প্রযুক্তিগত ডিজাইন বা নকশাগুলোর সংকলন দেখে আধুনিক যুগের মানুষ বিস্মিত হয়েছে। তাঁর সমকালে বা পরবর্তী কয়েক শতকেও এগুলো নিয়ে এত আলোচনা হয় নি। জেমস ওয়াট বাষ্পের শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরও দুশো বছর আগে লিওনার্দো এ বিষয়ে ওয়াকিফহাল হন। জলের ও হাওয়ার গতিপ্রকৃতির আকর্ষণ তাঁর কখনো মরে নি। লিওনার্দো মোমের সঙ্গে রং-এর পিগমেন্ট মিশিয়ে নতুন ধরনের প্যাস্টেলও তৈরি করতে চেয়েছিলেন। লিওনার্দো তাঁর বন্ধ গণিতজ্ঞ লুকা পাকিওলির মতনই বিশ্বাস করতেন গণিত ছাড়া শিল্প দাঁড়াতেই পারে না। মাপজোকের যত জ্যামিতিক চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন তার মধ্যে শিল্পীর দেখার চেয়ে বিজ্ঞানীর নির্মোহ অনুসন্ধিৎসাই প্রবল হয়ে ফুটে উঠেছে। যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ১৪৯০-এর ড্রয়িং 'দি ভিট্রুভিয়ান ম্যান'। ম্যাপ আঁকা ও আদর্শ শহরের নকশা আঁকা দেখলেজ তাঁকে দক্ষ কারটোগ্রাফার-এর মর্যাদা দিতে হয়। স্থাপত্যের খুঁটিনাটি জানতে তিনি অভিজ্ঞ রাজমিস্ত্রি ও পাথরশিল্পীদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা করতেন। বয়নশিল্প, এমন কী ওয়াইন তৈরি বিষয়েও তাঁ যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। জীবজন্তুদের আকৃতিপ্রকৃতি, গাছপালা, ফুল ফলের গঠন নিয়ে তিনি প্রচুর ড্রয়িং করে গেছেন। এমন কি ড্রয়িং-এর পাতাগুলো তিনি নিজের উপযোগী করে বিভিন্ন ওপেক রং-এর প্রলেপে প্রস্তুত করে নিতেন। লালচে, কমলা, নীল, সবজে বা ছাই রং-এর কাগজের ওপর সিলভার পয়েন্ট ও কালিকলমে আঁকতেন। লিওনার্দোর আগে ফ্লোরেন্সের শিল্পী আন্তোনিও পালইউলো শব ব্যবচ্ছেদ করে মানবদেহের খুঁটিনাটি অঙ্কন করে গেছেন। লিওনার্দো এই পথ ধরে প্রচুর ড্রয়িং করেন। ক্লাসিকাল যুগের চিকিৎসক গ্যালেন-এর রচনা তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। শুধু ছবি আঁকাকা নয়, তার সঙ্গে নোটসও লিখেছেন। মানুষের খুলি, চোখ, জিভ, ঝিল্লি, শিরা-উপশিরা, বিভিন্ন জায়গায় হাড়, পেশী, টিসু, যৌনাঙ্গ– পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি এঁকেছেন। হার্ভে-র অনেক আগেই তিনি মানবদেহে রক্ত সঞ্চালনের বিষয়টি ধরতে পেরেছিলেন। জ্বর কেন হয়, শরীর দুর্বল লাগে কেন, ঘুম কি, কেন ক্ষুধা পায়, কন্না কি,

নাকে ও গলায় মিউকাস কেন জন্মায়, খাদ্য ও স্নায়ুর সম্পর্ক কি, দৈহিক সুখ কি, গর্ভাবস্থায় শিশু কেমন করে থাকে—এসব ছিল তাঁর আগ্রহের বিষয়। শুধু এখানেই থামেন নি। নেশা কেন হয়, রাগ কেন নয়, কি করে মানুষ স্বপ্ন দেখে—এসবও জানার আগ্রহ ছিল। মানুষের দৈহিক রহস্য তিনি জানতে চেয়েছিলেন ধর্মের বাঁধন ও চার্চের অনুশাসন অগ্রাহ্য করেই। নোটবুকে লিখছেন—জীবনে সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হলো কোনো কিছুকে সম্পূর্ণ রূপে জানা। আর এক জায়গায় লিখছেন—যখন কেউ ঝরনার সন্ধান পায় তখন সে আর কুকজোর জলের কথা ভাবে না। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী অথবা অ্যাগনিস্ট ছিলেন তাও নয় কিন্তু চার্চ ও তথাকথিত ধর্মচর্চার বাড়াবাড়ি তাঁকে আকৃষ্ট করে নি। সঠিক অর্থে তিনিই ছিলেন প্রকৃত 'রেনেসাঁস ম্যান'।

নানান বিষয়ে লিওনার্দো পরীক্ষানিরীক্ষা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, উপহাসাস্পদ হয়েছেন, অপমানিত হয়েছেন, স্বদেশ ছেড়ে অন্য রাজার অধীনে চাকরি খুঁজতে গেছেন বাধ্য হয়ে। কিন্তু তার মত বহুমুখী প্রতিভার মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। হয়তো এমন হওয়াও সম্ভব নয়। ইতিহাস, বিজ্ঞানচর্চা, শিল্পচর্চা, বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব বিগত পাঁচশো বছরে পৃথিবীকে অন্য রূপ দিয়েছে। কিন্তু লিওনার্দো দা ভিঞ্চি-কে নিয়ে সবিস্ময় আলোচনায় ইতি পড়ে নি, ভবিষ্যতেও পড়বে না। তাঁর মৃত্যুর পাঁচশো বছর বাদে ফ্লোরেন্সে, রোমে ও পারি-তে তাঁর আঁকা ছবি দেখতে দেখতে এইসব কথাই প্রতিক্ষণে মনে হয়েছে।

প্রবন্ধ

আত্মপ্রতিকৃতি

লিওনার্দো: রেনেসাঁসের বিস্ময় প্রতিভা

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

১৪৮২। লিওনার্দোর (১৫ এপ্রিল, ১৪৫২–২মে, ১৫১৯০) বয়স তখন ৩০। ফ্লোরেন্সের উপর তিতিবিরক্ত। তিনি পাখির চোখ করলেন মিলানকে। লরেঞ্জো দ্য মেদিচি (১৪৪৯–১৪৯২) তাঁকে দৌত্যকার্যে পাঠালেন মিলানের ডিউকের কাছে। মিলানের শাসকের জন্য চারেক সুযোগ্য লোক দরকার ছিল।

একজন সামরিক প্রযুক্তিবিদ, একজন ভাস্কর, একজন স্থপতি ও একজন চিত্রশিল্পী। প্রতিটি পদের জন্য নিজের উপযুক্ততা দাবি করে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি একটি দরখাস্ত করে বসলেন। তাতে এগাররকম বিষয়ে নিজের পারদর্শিতা বিবৃত করে শেষে লিখেন—যদি উপরোক্ত যোগ্যতাবলি সম্পর্কে কারো মনে এটা অসম্ভব ও অবাস্তব দাবি তবে 'I offer myself as most ready to make the trial of them in your park, or in whatever place may please your Excellency, to whom I command myself with all possible humility' : কি কি পারি বলে লিখেছিলেন সেই আবেদনপত্রে—

যুদ্ধাস্ত্র বানানোয় যাঁরা বিশারদের মান্যতা পান তাঁদের অধিকাংশ অস্ত্রশস্ত্র সর্বজনীন ও সুপরিচিত যুদ্ধাস্ত্র থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়; সেক্ষেত্রে আমার উদ্ভাবনী পারদর্শিতা আপনার সকাশে একে একে নিবেদন করি—

১. আমি এমন সেতু নির্মাণ করতে পারি যা খুব হালকা, ভীষণ শক্ত এবং অত্যন্ত সহজে যা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়।

২। যখন কোনো জায়গা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে তখন ট্রেঞ্চ থেকে জল নিষ্কাষণ করে নানা ধরনের সিঁড়ি দিয়ে গোপনে বের হওয়ার ছক তৈরি করতে পারি।

৩. যে কোনো সুউচ্চ প্রাচীর বা দুর্গ তা সে প্রস্তর নির্মিত হলেও চূর্ণ করার কৌশল আমার জানা।

৪. গোলা বর্ষণকারী এমন সহজে বহনযোগ্য মর্টার আমি তৈরি করতে পারি যা দিয়ে ছোট ছোট পাথর নিক্ষের করে ধুম্রজাল সৃষ্টি করে শত্রুশিবিরে আতঙ্ক ও বিভ্রম সৃষ্টি করা যাবে।

৫. যুদ্ধ যদি সমুদ্রে হয় তবে এমন ভাসমান জাহাজ আমি তৈরি করতে পারি অক্রমণ করা ও আক্রমণ প্রতিরোধ করা দুয়েতেই সে সক্ষম—বৃহত্তম কামানের গোলাও তার কিছু করতে পারবে না।

৭. আমি এমন দুর্ভেদ্য ও আক্রমণ প্রতিরোধী সমরযান বানাতে পারি যা গোলা বারুদ্ধে আচ্ছন্ন শত্রুভূমিতে প্রবেশ করবে, তার পিছনে পিছনে পদাতিক বাহিনী কোনো ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার না করে অনাহৃত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারে।

৮. প্রয়োজন হলে আমি এমন কার্যকরী কামান, নিক্ষেপক যন্ত্র

বা যুদ্ধাস্ত্র বানাতে পারি যা সাধারণ যুদ্ধাস্ত্র থেকে আলাদা।

৯. যেখানে আগ্নেয় গোলাগুলি নিক্ষেপ করা চলবে না সেখানে প্রস্তর নিক্ষেপক যন্ত্র বা পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে হরেকরকম আক্রমণ ও আক্রমণ প্রতিরোধের কৌশল বের করতে পারি যা সাধারণভাবে অজ্ঞাত।

১০. শান্তির সময় আপনার বিনোদন ও নান্দনিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য পারিবারিক বা সামাজিক এমন স্থাপত্য বা বর্ম্য নির্মাণ করতে পারি যা অন্য যে কোনো স্থাপত্যকে প্রতি স্পর্ধা জানাতে সক্ষম। জলকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার সরবরাহ প্রাণালীও দক্ষতার সঙ্গে নির্মাণ করতে পারি।

৬. নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থানে পৌঁছানোর জন্য মাটির তলা দিয়ে নিঃশব্দে বানাতে পারি সুড়ঙ্গ; যদি প্রয়োজন হয় নদীর তলদেশ দিয়েও নিয়ে যেতে পারি সেই সুড়ঙ্গ।

১১. আমি ভাস্কর্য নির্মাণ করতে পারি, পাথর দিয়ে, ব্রোঞ্জ দিয়ে, মাটি দিয়ে। যে কোনো বিষয় ও ব্যক্তিকে নিয়ে আঁকতে পারি ছবি।

এছাড়া ব্রোঞ্জ নির্মিত এমন অশ্ব বানানোর দায়িত্ব নিতে পারি যা আপনার পিতৃস্মৃতি বা স্ফ্রোজা বংশের অমর গৌরব ঘোষণা করবে। (I.A. Richter(ed), selection from the Note Books of Leonardo Da Vinci, oxford, 1956)

ইতালিয় রেনেসাঁসের 'প্রিন্স অব আর্ট' আখ্যাত লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি সম্পর্কে নিবন্ধটা তার চাকরির দরখাস্ত দিয়ে শুরু করলুম এইজন্য এর মধ্যে ফুটে উঠেছে লিওনার্দোর অনন্য বহুমুখী প্রতিভার পরিচয়। ইতালির এক মানবতাবাদী পিকোদেল্লা মিরানদোলা (১৪৬৩–১৪৯৩) তাঁর 'অরেশন অন ডিগনিটি অব ম্যান' প্রস্তাবে লিখেছিলেন, 'Man can do all'। মানুষ সব পারে। রেনেসাঁসে দেখা গিয়েছিল তিনরকম প্রতিভাধর মানুষ–অনন্য, বহুমুখী ও বৈশ্বিক। লিওনার্দো চিত্রশিল্পী হিসাবেই বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছেন কিন্তু এই পত্রে তাঁর পারগতার যে পরিচয় ধরা পড়েছে তাতে চিত্রী সত্তা একটি পার্শ্বিক পরিচয় মাত্র। তিনি স্থপতি, ভাস্কর, চিত্রী এবং প্রযুক্তিবিদ। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে যে প্রত্যয় ফুটে উঠেছে এখানে তা বিশ্বকর্মাকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

এই চিঠিটা উদ্ধৃত করার আর একটা উদ্দেশ্য আছে। উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সর্বোত্তম প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-

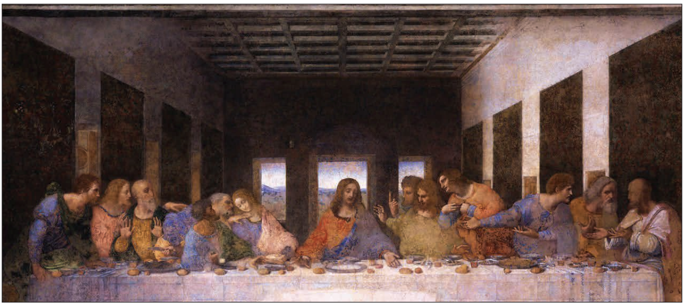

দি লাস্ট সাপার

১৯৪১) সঙ্গে ইতালীয় রেনেসাঁসের সর্বোত্তম প্রতিভার পার্থক্যটাও এতে স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথ কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গীতিকার, চিত্রকর, প্রাবন্ধিক, বিশ্বভারতীর স্থপয়িতা সব মিলিয়ে তাঁকে বলা যায় বঙ্গীয় রেনেসাঁসের স্বর্ণ শতদল তথাপি প্রযুক্তিবিদ্যা, প্রয়োগিক বিজ্ঞানে লিওনার্দোর সক্ষমতা তাঁকে একেবারে অন্যমাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রকাশের অধিদেবতা। মানবিক অনুভবকে ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন তিনি। সাহিত্যের নানা শাখায় তিনি মানুষের সর্বাঙ্গীন সত্তাকে পুষ্পিত ও পল্লবিত করে তুলেছিলেন। লিওনার্দো প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ভাষা নয়, রঙতুলিকে বেছে নিয়েছিলেন। শুধু লিওনার্দো কেন রেনেসাঁসের ইতালি আত্মপ্রকাশের জন্য বেছে নিয়েছিল চিত্রকলার পথ। Painting was the art of arts of Italy J.A Symonds Renaissance in Italy. vol-3 কিন্তু শুধু প্রকাশ নয় প্রায়োগিক বিদ্যার ক্ষেত্রেও ইতালি ছিল অনন্য ঔৎকর্ষের দাবিদার। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে মানবিক অনুভবের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন ভাষা শিল্পের মাধ্যমে গানে-কবিতায় তা লিওনার্দোর স্বপ্নের অগোচর ছিল আবার লিওনার্দো যা পারতেন ও যা করেছেন তা রবীন্দ্রনাথের সাধ্যের বাইরে। যুদ্ধের জন্য যতরকম কলাকৌশল, প্রযুক্তি, যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োজন হবে তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মাথা ঘামাচ্ছেন তা ভাবাই যায় না। হৃদয়বৃত্তির চর্চায় বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রকাশ সৌকর্য রবীন্দ্রনাথে থরে থরে সাজানো আছে কিন্তু ইতালীয় রেনেসাঁস শুধু নন্দন চর্চায় নয় মেধায় ঔৎকর্ষকেও মিলিয়ে নিয়েছিল তা লিওনার্দোকে দেখলে টের পাওয়া যায়। লিওনার্দোর প্রতিভামঞ্চে বসেছিল মস্তিষ্কবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির এক আশ্চর্য যুগলবন্দির আসর।

এবারে প্রবেশ করা যাক লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি সম্পর্কে সামগ্রিক

পরিচয়-চুম্বক তুলে ধরার কাজে। কখন জন্মেছিলেন? কোথায়? তার পিতৃ মাতৃ পরিচয় কি? দু'এক ছত্র লিখলেই যেখানে মিটে যায় এই গোড়ার কথা লিওনার্দোর ক্ষেত্রে তা হবার উপায় নেই। জন্মস্থান ও জন্মতারিখ নিয়ে গোলমাল নেই। ১৪৫২, ১৫ এপ্রিল তিনি জন্ম নেন আর্চিয়ানো নামক এক পাহাড়তলিতে। ফ্লোরেন্স থেকে আধঘণ্টা ট্রেন যাত্রা করলে পৌঁছানো যায় টাসকান প্রদেশের এক শহরতলিতে। জায়গাটার নাম ভিঞ্চি। ভিঞ্চি থেকে কয়েক মিনিটের বাসপথ আর্চিয়ানো। সবুজ ল্যান্ডস্পেস শান্ত পাহাড়, আঙুরখেত আর অলিভ গাছ দিয়ে ঘেরা বিরিবিলি গ্রাম। এমনই অচেনা অজানা সেই গ্রাম যে লোককে বলার জন্য অপেক্ষাকৃত পরিচিত মফস্বল শহর 'ভিঞ্চি'র নামটাই উঠে আসত। আদি নাম কি বিশ্ববিখ্যাত এই প্রতিভাধরের? Leonardo di ser piero da Vinci (Leonardo son of Piero, bron Vinci)। সন অব পিয়েরো। পাওয়া গেল বাবার নাম পুরো নাম পিয়েরো ফ্রুয়োসিনো ডি আন্তোনিও দ্য ভিঞ্চি (১৪২৭-১৫০৪)। ভিঞ্চির আন্তোনিও পুত্র দিয়েরো ফ্রুয়োসিনো। ভিঞ্চির একটি সম্পন্ন পরিবারের যুবক পিয়েরো। ফ্লোরেবন্সের উকিল (নোটারি) মা? মাতৃপরিচয় নিয়ে গবেষণা করতে করতে গবেষকদের মাথার চুল উঠে গেছে। কেননা লিওনার্দো ছিলেন কুমারী মায়ের সন্তান। মায়ের নাম ক্যাটারিনা। যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৫ বছর তখন তিনি লিওনার্দোকে গর্ভে ধারণ করেন। লিওনার্দো হচ্ছেন love child of a notary or natural son. পিয়েরো তখন ২৪ বছরের যুবক। ফ্লোরেন্সে ওকালতি করেন। অধ্যাপক কেম্প বলছেন, কাগজপত্র বলছে 'he took a break in july 1451, "exactly the right weeks for her impregnation" তাঁর ভাষাতেই বলি Nice spring evening probably in the fields and that was it." লিওনার্দোর জন্ম হয়ে গেল কিন্তু পিয়েরোর সঙ্গে ক্যাটারিনার বিয়ে হল না। পিয়েরোর বিয়ে হল অন্য মেয়ের সঙ্গে। ক্যাটারিনার বিয়ে হল অন্য ছেলের সঙ্গে (আন্তোনিও দি পিয়েরো বুটি) সেই সূত্রে ক্যাটারিনার নাম হল ক্যাটারিনা বুটি ডেল ভাক্কা। লিওনার্দোর শৈশব কেটেছে ভিঞ্চিতে পিয়েরোর পিতৃদেবের আস্তানায়। পিয়েরোর পরিবারেই বিবাহ সম্পর্কহীন মাতা পিতার সন্তান লিওনার্দোর ছেলেবেলা কাটে। ক্যাটারিনা সম্পর্কে গবেষকরা দুরকম কথা বলেন—এক, তিনি ছিলেন উত্তর আফ্রিকা বা তুরস্ক

থেকে আসা এক ক্রীতদাসী। ‘his mother was Middle East origin – এটা কাপাসোর অভিমত। তিনি লিওনার্দোর নোট বইয়ে, ছবিতে লেগে থাকা প্রায় ২০০ আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করে সুদীর্ঘ গবেষণায় দেখেছেন আরবের লোকজনের আঙুলের ছাপের সঙ্গে ৬০ ভাগ মিলে যায়। (The Finger Print of Leonardo da Vinci, Luigi capasio, 2008) অন্য গবেষকরা বলেন ‘ethnicity based on fingerprint is vague’। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় যে মতটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটির প্রবক্তা মার্টিন কেম্প। Monalisa : The People and the painting vvp 2017) তিনি সে সময়ের ট্যাক্সের কাগজপত্র নিয়ে পরীক্ষা করে বলেছেন ক্যাটারিনা স্থানীয় এক কৃষক পরিবারের মেয়ে তার বাবা-মাকে ছেড়ে চলে যায়। ফলে তাকে অনাথাই বলা যায়। নাম ক্যাটারিনা ডি মেও লিপ্পি (১৪৩৬ ভিঞ্চি – ২৬ জুন ১৪৪৯, মিলান)। তো এই হল লিওনার্দোর জন্মবৃত্তান্ত বিবাহ সম্পর্কহীন পিতৃমাতৃ পরিচয়।

বছর চোদ্দ বয়সে তাঁদের পরিবার ফ্লোরেন্সে উঠে এলে তিনি হলেন স্টুডিও বয়। সে সময়ে এক অগ্রগণ্য শিল্প শিক্ষার ভেরোচ্চিওর শিক্ষণশালায় (১৪৩৫-১৪৮৮) ওয়ার্কশপে। সতের বছর থেকে তিনি শিক্ষণশালার একনিষ্ঠ সহকারি। একই কর্মশালায় আছেন ঘির লান্ডিনো (১৪৪৫-১৫১০), পেরুগিনো (১৪৪৬-১৫২৩ রাফায়েলের গুরু), বতিচেল্লি (১৪৪৫-১৫১০, ভেনাসের জন্ম খ্যাত), লরেঞ্জো দ্য ক্রেজি (১৪৫৯-১৫৩৭)। এখানে থাকাকালে গুরু-শিক্ষ্য একসঙ্গে আঁকলেন খ্রিষ্টের দীক্ষা ছবি। (কাঠের উপর তৈলচিত্র)। পিছনে রইল লিওনার্দেস্ক ল্যান্ড স্কেপ। এ ছবি ১৪৭২-৭৫ সালে আঁকা। লিওনার্দোকে বলা হয়েছিল একটা দেবদূত আঁকার জন্য। সেটা এমন বিস্ময়কররূপে সুন্দর হয়েছিল যে ভাসারি লিখেছেন, ভেরোচ্চিও ছবি আঁকা ছেড়ে দেন। আসলে তিনি ছিলেন মূলত ভাস্কর। ভেরোচ্চিওর ওয়ার্কশপে থেকে তিনি শিল্পের তাত্ত্বিক সূত্র এবং নির্মাণ-কারিগরি দুই-ই শিখলেন। ড্রাফটিং, রঙের রসায়ন, ধাতুবিদ্যা, ধাতব নির্মাণ, প্লাস্টার কাস্টিং, চামড়ার কাজ, প্রযুক্তিবিদ্যা, কারুশিল্প এসব তো শিখলেনই তারসঙ্গে ড্রইং, পেন্টিং স্কাল্পটি) এবং মডেলিং-এর যাবৎ শিল্পশৈলী রপ্ত করলেন সাত বছর ধরে।

১৪৭২ সাল নাগাদ যখন তাঁর বয়স কুড়ি তখন হলেন ‘গিল্ড অব সেন্টলুকের সদস্য। সেন্ট লুককে ধরা হত শিল্পীদের পেট্রন। তাই

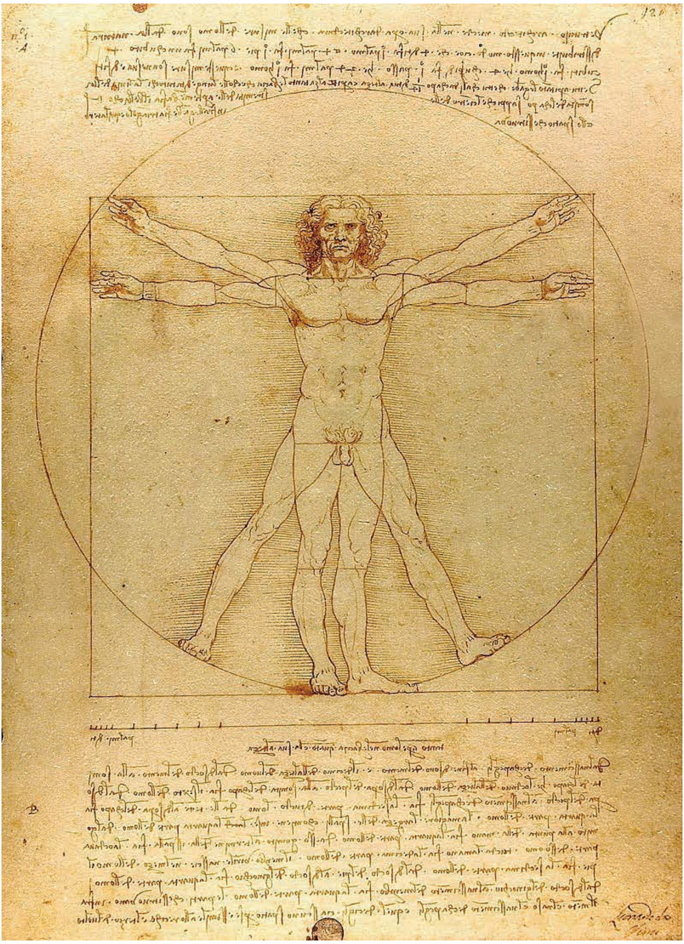

লিওনার্দোর আঁকা মানবদেহের অ্যানাটমি

তাঁর নামে নানা ধরনের শিল্পী ও একাডেমিসিয়ানদের মিলনকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। ভিঞ্চি সেখানে এসে নানা বিদ্যা-শৃঙ্খলার মানুষের আস্বাদ পেলেন। ১৪৭৩ সালে তার আঁকা অরনো অধিত্যকা প্রথম কালি—কলমের ছবি।

১৪৭৮ সালে তিনি এককভাবে ছবি আঁকার বরাত পেলেন সেন্ট বারনাভ চ্যাপেলে। ১৪৮০ সাল নাগাদ তিনি আসেন বিখ্যাত মেদিচি পরিবারের সংসর্গে। 'পিয়াজা সান মার্কো'র উদ্যান বাটিকায় কাজ করেন। সবচেয়ে বড় কথা সেখানকার বিখ্যাত নিওপ্লেটোটিক একাডেমিতে তিনি প্রবেশ করেন যেখানে কবি দার্শনিক শিল্পীরা এসে মিলতেন। এর মধ্যে তিনি ডাক পান মিলানের ডিউক লুডোভিকো স্ক্রোজার (১৪৫২-১৫০৮) কাছ থেকে। মেদিচিরদের

একজন লিওনার্দো সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, এই লোফকিকে দিয়ে কিছু হবে না। এ কাজ শুরু করার আগে ভাবতে থাকে শেষটা নিয়ে। ...... লিওনার্দো বলেছিলেন 'Florence has made me and ruined me'.....। ফ্লোরেন্স ছিল হিউম্যানিস্টদের কবজায়, হিউম্যানিস্টদের কাজ ছিল Revival of classical Leanning তার মধ্যে ডুবে থাকা লিওনার্দোর কাজ নয় কি হবে ও কি করতে হবে সেই প্রায়োগিক জগৎ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। তাই পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও অসম্পূর্ণ কাজ পিছনে রেখে তিনি পাড়ি দিলেন মিলানের পথে। ১৪৮২ থেকে ১৪৯৯ জীবনের সেরা সতেরোটা বছর তিনি কাটিয়েছেন মিলানে। মিলান ছিল বাস্তববাদী, বিজ্ঞানমনস্ক একটা শহর। স্ট্রাটেজিক অবস্থানের কারণে যুদ্ধবাজও বটে। মিলানের ডিউক লুডোভিকো ইল মোরো এবং তার স্ত্রী বিয়ত্রিসে (১৪৭৫-১৪৯৭) ছিলেন লিওনার্দোর পৃষ্ঠপোষক। লুডোভিকোকে বলা হয় প্রিন্স অব রেনেসাঁস। রেনেসাঁসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজন্যক। শিল্প, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানবাদী মেধার প্রধান লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ছিলেন শিল্পী শিরোমণি 'প্রিন্স অব আর্ট'। আর লুডোভিকোর স্ত্রী বিয়াত্রিসে দ্য এসে ছিলেন রেনেসাঁসোর অন্যতম সেরা পৃষ্ঠপোষিকা, 'উত্তমেন অব রেনেসাঁস'। লিওনার্দোর সঙ্গে লুডোভিকোর মিলন যেন সোনার সঙ্গে সোহাগার মিলন। এই মিলানে লিওনার্দো কাটালেন তাঁর জীবনের সেরা ফলপ্রসূ সময়। যেমন শিল্প চর্চায় তেমনি প্রায়োগিক বিজ্ঞান চর্চায় একটা উল্লেখযোগ্য মিলান পর্ব। এখানে তিনি আঁকলেন তাঁর সুবিখ্যাত ছবি 'ভাজিনি অব দ্য রক (১৮৮৩-১৪৮৬)। পাহাড় জল আর গাছপালার রহস্যময় প্রেক্ষিতে মেরী ও অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে শিশু যিশু ও বালক সেন্ট জনের ছবি। প্রোট্রেট অব এ মিউজিশিয়ান (১৪৯০), লেডী উইথ এরমিন (১৪৯০) লুডোভিকোর মিসট্রেস সেসিলিয়া গাল্লেরানিকে মডেল করে আঁকা এই ছবি পবিত্রতার প্রতীক যেন। আর তিনি এঁকেছেন সুবিখ্যাত লাস্ট সাপার (১৪৯১-১৪৯৮) ছবিটি যা মিলানের সান্তা মারিয়া দেল্লে প্রেক্ষিতে শোভা পাচ্ছে। নিখুঁত জ্যামিতিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় গুরুত্বে যিশুকে এমনভাবে রেখেছেন যে অঙ্কবিদ্যা ও শিল্পবোধ একলয়ে এসে মিলেছে। এই কাজটি করার জন্য লুডেভিকো তাঁকে একটি দ্রাক্ষাখেত সমন্বিত উদ্যান বটিকা উপহার দেন। সেখান থেকে কাজটি সম্পন্ন করেন তিনি। কিন্তু অস্থায়ী রঙের ব্যবহারে ছবিটি অচিরে বিনাশের দিকে

এগোতে থাকে তবে অনেক চেষ্টায় সেটি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এটিকে লিওনার্দোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প কর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। শিল্পবোদ্ধারা লিওনার্দোর যে সব মহৎ শিল্পকর্ম অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে তার মধ্যে 'ইকুয়েস্ট্রিয়ান স্ট্যাচু অব ফ্রান্সিসকো স্ক্রোজা' অন্যতম। দশ বছর ধরে অসংখ্য স্কেচ এঁকেছেন, বানিয়েছেন ১৬ ফুট উঁচু ক্লে মডেল। ১০০ টন ওজনের ব্রোঞ্জ দিয়ে একটা বানানোর কথা ছিল। কিন্তু তা আর বানানো হয়ে ওঠেনি। যুদ্ধ এসে পড়ে মিলানের ঘাড়ের উপর। তখন সেই ১০০ টন ব্রোঞ্জ দিয়ে বানানো হয় কামান। আক্রমণকারী সৈন্যদের হাতে বিধ্বস্ত হয় মৃত্তিকা নির্মিত মডেলটি। তার কয়েকশ বছর পর ১৯৯৯ সালে সেটি পুনর্নির্মাণ করেন নীনা আকাসু নামে এক শিল্পী। ১৪৯০ সালে মিলানে তাঁর আঁকা 'ভিওর ভিয়াস ম্যান' শিল্প ও অঙ্ক বোদ্ধাদের সবিশেষ আলোচনার বিষয়। স্কোয়ার ও সার্কেলের মধ্যে প্রসারিত বাহুর এই মানবমূর্তি নাকি মুক্ত মানব সামর্থের জাদুতে ঠাসা।

লিওনার্দোর মিলান পর্ব শুধু ছবি আঁকা বা শিল্পকর্মের জন্য নয় তাঁর নোটবই 'কোডেস আটলান্টিকাস' যাতে মানুষের দৈহিক গঠনের অস্থি সন্ধি নিয়ে গবেষণাভিত্তিক স্কেচ ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তির নানা স্কেচ পাতায় পাতায় খচিত হয়ে আছে তার প্রস্থান পর্বও বটে। বিজ্ঞানীর উদ্ভাবনী ও প্রযুক্তিক উদ্ভাবনীর সুবর্ণ পরিসর দিয়েছিল মিলান—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

লুডোভিকো দ্বাদশ লুই-এর হাতে পরাস্ত ও বন্দি হলেন (১৫০০) ।লিওনার্দোকেও পাততাড়ি গোটাতে হয় তিনি আগেই সরে পড়েন। ঝড় আসবার আগেই বুনো হাঁসটি উড়ে গেল যেন। প্রথমে ভেনিসে গিয়ে সমর স্থপতির কাজ নিয়েছিলেন। ১৫০২ খ্রিষ্টাব্দে কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সিজার বর্গিয়ার অধীনে প্রধান মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্ব নিয়ে পেট্রনের সঙ্গে ঘোরেন সারা ইতালি। সামরিক স্ট্র্যাটেজির প্রয়োজনে এসময় এমন দুটি মানচিত্র রচনা করেন যা আগে কখনো আঁকা হয়নি। ইমোলা শহরের মানচিত্র তো প্রায় স্যাটেলাইট ম্যাপের মতো। এসময় ফ্লোরেন্স-এর সমুদ্র সন্নিকটে নির্মাণ করেন একটি বাঁধ যা সারা বছরের জল সরবরাহ করতে পারবে। ১৫০৩ সালে তিনি বর্গিয়ার চাকরিতে জবাব দিয়ে ফেরেন ফ্লোরেন্সে।

আর এই ১৫০৩ সালেই তিনি শুরু করেন ফ্লোরেন্সের এক সম্পদশালী চর্ম ব্যবসায়ী ফ্রাঞ্চেস্কো লা জিওকন্দোর তৃতীয় পত্নী

সুন্দরী লিসা দেল জিওকন্দোর (১৪৭৯-১৫৪২) প্রতিকৃতি আঁকার কাজ। সারা পৃথিবী লিওনার্দোকে চেনে যে ছবির জন্য সে হচ্ছে এই প্রতিকৃতি। মোনালিসা নামেই তার পরিচয়। জন লিচফিল্ড লিখেছেন, 'the best known, the most visited, the most written about, the most sung about, the most parodied work in the world. পরিপ্রেক্ষিতের বিস্তার, কম্পোজিশনের জমাটি রূপ, রূপের সংহত ঐশ্বর্য এবং রহস্যময় হাসি নিয়ে মোনালিসা লিওনার্দোর অসামান্য শিল্প প্রতিভার প্রতিভূচিত্র হয়ে বিরাজ করছে। ১৫০৩ থেকে ১৫০৬-এর অঙ্কন সময়। কথা ছিল ১৫০৫-এর ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ করবেন। যথা সময়ে শেষ না হওয়া নিয়ে অনেক গল্প আছে। গুইলানো দ্য মেদিচি অসম্পূর্ণ ছবিটি অনেক দিন নিজের কাছে রেখেছিলেন। এটি সম্পূর্ণ হয় অনেক পরে। ১৫১৬ সালে ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সিস প্রথম এটি বহু টাকা মূল্যে কেনেন। লুভরে রক্ষিত এই ছবিটি নিয়ে যত ঘটনা ঘটেছে 'গল্প রয়েছে ও গবেষণা হয়েছে তা একসঙ্গে করলে একটা মহাভারত হয়ে যাবে। এখনও সংবাদ জগতে ফিরে ফিরে আসে 'মোনালিসা'র গল্প। বিশ্বের সংবাদ কৌতূহলীদের তিনটি বাতিক আছে এক, তুতান খমেন; দুই, সেকস্‌পীয়র; তিন, মোনালিসা। মোনালিসা নিয়ে চিত্র রসিকরা যত মাথা ঘামিয়েছেন বিজ্ঞানের গবেষকরা তার তুলনায় কম মাথা ঘামাননি। কতরকম তার ব্যাখ্যা, কতরকম তার নির্ণয় প্রয়াস সে বলে শেষ করা যাবে না।

লিওনার্দো ১৫০৬ সালে মিলানে ফিরেছিলেন। ১৫১৩ থেকে ১৫১৬ ছিলেন রোমে। থাকতেন ভ্যাটিকানের বেলভেডিয়ার কোর্টে। উল্লেখযোগ্য যে সেই সময় ইতালীয় রেনেসাঁসের শিল্পভুবনের তিন মহারথী রাফায়েল (১৪৮৩-১৫২০) মাইকেল অ্যাঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪) ও লিওনার্দো আলাদা আলাদা কাজে রোমে ব্যাপৃত ছিলেন। রাফায়েল ছিলেন পোপের ব্লু বয়। রোমই ছিল তাঁর প্রধান কর্মভূমি। আর সিস্টিন চ্যাপেল খ্যাত মাইকেল অ্যাঞ্জেলো ছিলেন রোম অন্ত প্রাণ। সে তুলনায় লিওনার্দো রোমের অতিথি মাত্র। বৃদ্ধ বয়সের আত্ম প্রতিকৃতি ও সেন্টজনের ছবি এখানেই আঁকা। মেদিচিদের সমৃদ্ধির অন্যতম উৎস ছিল রঙ উৎপাদন। লিওনার্দো এখানে মাথা খাটিয়েছেন তাই নিয়ে।

১৫১৬-তে ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সিস-১ম মিলান পুনর্দখল করেন।

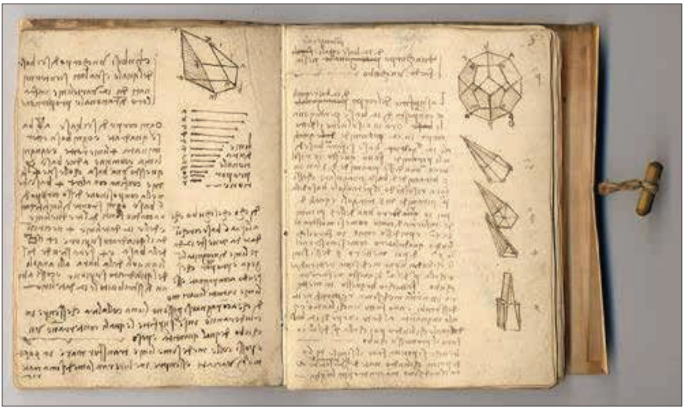

লিওনার্দোর নোট বই এবং নোটবইয়ের ভিতরের পৃষ্ঠা

বলোগনাতে ১৯ ডিসেম্বর ফ্রান্সিস ১ম ও পোপ লিও-দশমের সাক্ষাৎ সভায় লিওনার্দো উপস্থিত ছিলেন। ১৫১৬ সালে তিনি ফ্রান্স অধিপতি ফ্রান্সিসের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেন। রাজনিবাসের সন্নিকটে 'ক্লস লুসে' তাঁর থাকার বন্দোবস্ত হয়। বেনভেনুতো সেল্লিনি লিখেছেন, গুণমুগ্ধ ফ্রান্সিস-১ম লিওনার্দোকে ৭০০ স্বর্ণ মুদ্রার (e cus) বিনিময়ে 'The first painter, engineer and architect' পদে নিয়োগ করেন। জীবনের শেষ পর্বেও ক্লস লুসে তিনি যথেষ্ট কার্যকরী সময় কাটিয়েছিলেন। 'চ্যাটু ডি শ্যামবোর্ডে' তিনি বানান 'double spiral stair case'। পরিকল্পনা করেন দুই নদীর মধ্যে খাল সংযোগ ঘটিয়ে বাণিজ্যের সমৃদ্ধি সাধনের। ভাসারি লিখেছেন ১৫১৯ সালের ২ মে 'ক্লসলুসে' লিওনার্দো মারা যান রাজার হাতে মাথা রেখে। মারা যান স্ট্রোক হয়ে। রাজার হাতে মাথা রেখে মৃত্যুর কাহিনী অনেকের মতে গল্প মাত্র। ভাসারি লিখেছেন, মৃত্যু শয্যায়

শুয়ে তিনি অনুতাপ করেছিলেন এই বলে যে ঈশ্বর ও মানুষকে তিনি রুষ্ট করেছেন, কেননা শিল্প সাধনায় যা তার করার কথা ছিল তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। (by failing to practice his art as he should have done)। অপত্নীক এই শিল্পীর উইল অনুসারে ষাটজন ভিক্ষুক তার কফিনের পিছনে মোমবাতি নিয়ে হেঁটেছিলেন। তাঁর কবর হয়েছে 'চ্যাটু দ্য অ্যাসবয়েসে' কলেজিয়েট চার্চ অব সেন্ট ফ্লোরেনটিসে'। ফ্রান্সে। সেল্লিনি লিখেছেন, তার চেয়ে বেশি জানে এমন মানুষ জন্মেচেছ কিনা তিনি জানেন না। শুধু ছবি, ভাস্কর্য, স্থাপত্যের কথা নয় 'he was a very great philosopher'। সম্ভবত এই কারণেই রাফায়েল তাঁর আঁকা বিশ্ববিখ্যাত 'দি স্কুল অব এথেন্স' ছবিতে ৫৮ জন দার্শনিকের কেন্দ্রভূমিতে তর্করত প্লেটো ও এরিস্টটলের মধ্যে প্লেটোর মুখে বসিয়েছেন লিওনার্দোর মুখের আদল। এ ছবি রাফায়েল রোমে বসে এঁকেছিলেন। এঁকেছিলেন ১৫০৯–১৫১১ সালে। লিওনার্দোর থেকে বয়সে ৩১ বছরের ছোট ছিলেন রাফায়েল। কিন্তু প্রতিভার তুঙ্গে। লিওনার্দো তখনও বেঁচে। জীবৎকালেই তিনি কিংবদন্তী। ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস তাঁকে জয় করা ট্রফির মতো নিয়ে গিয়েছিলেন ফ্রান্সে– 'king of France carried him away like a trophy'। সেখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেখানেই তিনি চির নিদ্রিত হয়ে আছেন। তারপর ৫০০ বছর কেটে গেছে। লিওনার্দো এখনও বিস্ময়ের কেন্দ্রে। লিয়ানা বোলর্টন লিখেছেন, 'Five centuries have passed yet we still view Leonardo with awe. (Liana Borlton, Life and Times of Leonardo, 1967) ।

কারা তাঁকে দেখেন অবাক বিস্ময়ে, কারা তাঁকে নিয়ে চর্চা করেন? শিল্প রসিক মানুষজন। না শুধু তারা নন, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, দার্শনিক সঙ্গীতবেত্তা সকলে। কেননা তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সৃজনশীল ও মননশীল মানুষ। 'Polymath, many sided Genius,' 'wizard of the Renaissance' ...... (Will Durant, the story of civilization, the Renaissance, vol-v, 1963) এইসব অভিধার, অভিজ্ঞাত করা হয় তাঁকে। কি কি তিনি পারতেন, কি কি করেছেন, কি কি নিয়ে ভেবেছেন কি নিয়ে লিখেছেন তা সত্যই বিস্ময় উদ্রেক করার মতো। তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগের বিষয় তালিকা

এইরকম– drawing, painting, sculptune, architecture, science, music, mathematics, engineering, literature, anatomy, geology, astronomy, botany, palaeontology, Cartography,

রেনেসাঁসবিদদের মতে লিওনার্দো ছিলেন 'ফুলেস্ট ম্যান অব দ্য রেনেসাঁস'। রেনেসাঁস ছিল চার্চ শাসিত শীতযুগের পর বসন্ত সমাগমের ঋতু। ডাঁটা সার ইউরোপীয় জীবন ইতালীয় রেনেসাঁসে নবীন পত্রপুষ্পে ভরে গিয়েছিল যেন। লিওনার্দো হচ্ছেন ইতালীয় রেনেসাঁসের সেই বহু শাখাযুক্ত বৃক্ষ যার মধ্যে মানবসম্ভাবনার অজস্র কুসুম সঞ্চরিত হয়েছিল। মেধার বৈভব ও নান্দনিকতার ঐশ্বর্য একই সঙ্গে ফলভারানত। রেনেসাঁসে ঘটে ব্যক্তি প্রতিভার বিস্ফোরণ। মননশীলতা ও সৃজনশীলতার দিক থেকে এই সপ্রতিভ যুগটিকে এঙ্গেলস এই ভাষায় অভিনন্দন জানিয়েছেন।

"আজ পর্যন্ত মানুষ যা দেখেছে তার মধ্যে এইটি সবচেয়ে প্রগতিশীল বিপ্লব। এ যুগের প্রয়োজন ছিল অসাধারণ মানুষের এবং তার সৃষ্টিও হয়েছিল, যাঁরা ছিলেন চিন্তাশক্তি, নিষ্ঠা, সর্বজনীনতা ও বিদ্যায় অসাধারণ। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি কেবলমাত্র একজন মহান চিত্রশিল্পীই ছিলেন না, সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ, কুশলী যন্ত্রবিদ ও ইঞ্জিনিয়র।... সেই সময়ের মহান মানুষেরা তখনও তাঁদের উত্তরসূরিদের মতো শ্রমবিভাগের দাসত্ব বন্ধনের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে ওঠেননি। চরিত্র বৈভব এবং চরিত্রশক্তির গুণে এঁরা হয়ে উঠতেন পূর্ণাঙ্গ মানুষ। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, ডায়লেকটিকস অব নেচার (১৮৮৩, প্রথম প্রকাশ ১৯২৫)।

বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছিলেন আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর বৈগুণ্যে– 'সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলী, কিন্তু কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখানা মানুষ। অথবা যে সৌন্দর্য্যদত্ত প্রশ্ন, সর্বসৌন্দর্য্যের রসগ্রাহী, কিন্তু জগতের অপূর্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অজ্ঞ। সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ববিহীন। (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ধর্মতত্ত্ব, নবম অধ্যায়, জ্ঞানার্জনীবৃত্তি ১৮৮৮।

রেনেসাঁসে চলে পূর্ণ মানুষের সাধনা। লিওনার্দো 'fullest man of the Renaissance। ক্রমাগত কর্ষণ ও ঘর্ষণের মধ্যে

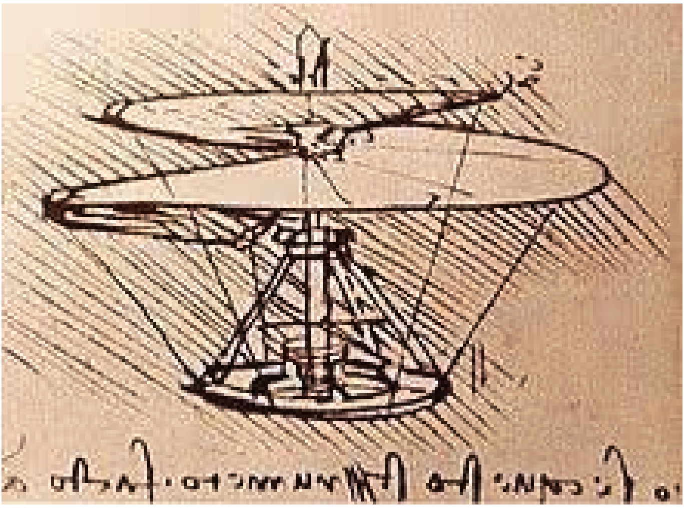

লিওনার্দোর আঁকা আকাশযানের নকশা

দিয়ে লোহার তরবারি যেমন শাণিত ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে লিওনার্দো তাই। তাঁর সম্পূর্ণ আঁকা ছবি কটি পাওয়া গেছে? সাকুল্যে খান পনের। বাকি সবই অসম্পূর্ণ, নিভৃত সাধনার উপাদান। এঁকেছেন প্রায় সতেরো হাজার স্কেচ। ক্রমাগত প্রস্তুতির দলিল। এত জ্ঞানী মানুষ। বই লিখেছেন ক'খানা? একটিও নয়। অথচ ডায়েরি বা নোট লিখেছেন প্রায় ১৩ হাজার পৃষ্ঠার। লেখা ও নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক অঙ্কনে তার পাতায় পাতায় বিস্ময় ঠাসা আছে। লিওনার্দোর নোটবই নিয়ে বিজ্ঞানের নানান শাখার গবেষকরা এত বছর ধরে গবেষণা করেও কিনারা করতে পারছেন না। বাঁধানো নোটবই নয় যেখানেই যেতেন সঙ্গে রাখতেন নানা মাপের বিচ্ছিন্ন কাগজ যা কিছু দেখতেন, জল, আকাশ, নক্ষত্র, মাটি, গাছ, আগুন, নদী, মানুষ, মানুষের মুখ, প্রাণী, পাহাড়, যুদ্ধাস্ত্র, পাখি, শবদেহ, ব্যবচ্ছেদ, ফসিল সব নোট নিতেন ও আঁকতেন। বাঁ হাত দিয়ে লিখতেন ডানদিক থেকে। লেখার ধরণও বড় অদ্ভুত। উলটো করে লিখতেন। আয়নায় দেখলে সোজা করে পড়া যেত। যত লেখা ততো আঁকা। জটিল সব বৈজ্ঞানিক রহস্য ও কারিগরি সমস্যার সমাধান কষা বা আঁকা আছে সেই নোট বইতে। মানব বা জীব দেহের গঠনগত ব্যবচ্ছিন্ন রূপ, গর্ভস্থ শিশুর অবস্থান রহস্য, তার হাড়, পাঁজরা, দেশি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ল্যানসেট দিয়ে চিরে চিরে দেখেছেন। নোট বইতে অঙ্কিত আছে শত শত স্কেচ। ব্রিজ, ক্যানাল, আকাশযান, নিক্ষেপক যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের নানা কৌশল ও কারিগরি

প্রকল্প প্রস্তাবনা। লিওনার্দো জ্ঞানচর্চার জন্য বেঁচেছেন, আমৃত্যু চর্চা করেছেন জ্ঞানের। ডায়েরিতে লিখেছেন, "I thought I was learning to live. I was only learning to die." জানার জন্য বাঁচি, জানার জন্য মরি। উত্তরকালের বহু মেকানিকাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং নির্মাণবিদ্যার চিন্তাধারা ও আগাম নকশা তার প্রায়োগিক কাজকর্মে ও নোটবইতে লিপিবদ্ধ আছে। তার একটা অসম্পূর্ণ তালিকা এখানে দেওয়া যেতে পারে। মানুষের উড়ান কৌশল নিয়ে তাঁর একটা আগ্রহ ছিল। তিনি প্রকৃতিকে জয় করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন মানুষকে জয়ী করতে।

	লিওনার্দো কৃত স্কেচ	প্রথম সফল ব্যবহার
হেলিকপ্টার	১৯৪৩	১৯০৬
প্যারাসুট	১৪৮৫	১৭৮৩ লুই সেবাকটিয়েন লেবোরম্যান্ড
মেসিনগান	১২ ব্যারেল ও ৩৩ ব্যারেলের স্কেচ	১৮৬১ গ্যাটলিং গান
ডুবুরির পোশাক	ভেনিসে থাকাকালে পরিকল্পিত	১৭১০ জন লেথব্রিজ
ট্যাঙ্ক	an armoved Vechicle Made from wood and Operated by eight men	১৯১৬ সালে ১ম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশরা প্রথম ট্যাঙ্ক নামায়
রোবট	১৯৪৫ Humanoid robot Based on Vitruvian Man	১৯২৮ first humanoid robot, Eric Exhibited
গ্রাভিটি অ্যান্ড পারপিচ্যুয়াল মেসিন	১৪৯৪	১৬১৮ রবার্ট ফ্লাড আইজ্যাক নিউটন (১৬৮৭)
জিওলজি অ্যান্ড ইভোলিউশন	Apes, monkeys related to the mans almost the same species	বিবর্তন তত্ত্ব ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২)
গ্লাইডার	design for glider in Leonardo's Note book 'pure gliding without flapping	১৯৯৩ রবি হুইটাল
বলবিয়ারিং	১৪৯৮-১৫০০	১৭৯৪ ফিলিপ ভগান

এসব বিস্তারিত লেখা সহজ কথা নয়। এখানে শুধু ইঙ্গিতটাই

লিলি। লিওনার্দোর আঁকায়।

দিলাম। সঙ্গীত যন্ত্র নিয়েও তাঁর মৌলিক ভাবনা ছিল। ১৪৮২ সালে মিলানে গিয়ে ডিউকের সভাসদদের প্রথম মুগ্ধ করেছিলেন ছবি এঁকে নয়, তাঁর বানানো অভিনব সঙ্গীতযন্ত্র উপস্থাপন করে। ঘোড়ার মাথার খুলি ও ভেড়ার শিং দিয়ে বানানো রূপোর তারযন্ত্র (সেতার) বানিয়ে তিনি আসর মাত করেন। সঙ্গীত যন্ত্র নিয়ে তাঁর গবেষণা ও ভাবনাচিন্তা কোন স্তরে পৌঁছেছিল তা বোঝা Viula organista নামক একটি অভিনব সঙ্গীত যন্ত্র পরিকল্পনার কথা বলব। এই সঙ্গীত যন্ত্রটি খুবই জটিল ধরনের—একটা তারযন্ত্র যা বাজাতে একটি ঘূর্ণিয়মান চাকা, ঘোড়ার পুচ্ছ কেশ এবং একটি ধনুক লাগবে। অনুরণিত ধ্বনির মায়াময় সুরমুর্চ্ছনা সৃষ্টির এই লিওনার্দীয় পরিকল্পনা হিসেবের অঙ্ক হয়ে তাঁর নোটবইতে কাগজে কলমে থেকে গিয়েছিল। পাঁচশো বছরের দোরগোড়ায় এসে ২০১৩ সালে পোল্যান্ডের সঙ্গীত পরিচালক জুবারাস্কি ...... একাডেমি অব মিউজিক-এর এক অনুষ্ঠানে ৫০০০ ঘণ্টার পরিশ্রমে বানিয়ে তোলা এই লিওনার্দীয় যন্ত্র সঙ্গীত বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দিয়েছেন। সেই সাফল্যের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে 'দি সিডনি মর্নিং হেরাল্ডে (২০১৩, ১৮ নভেম্বর)। লেখাটির শিরোনাম 'Leonardo Da Vinci's wacky piano is heard for the first time, after 500 years.'

রেনেসাঁস যে অনন্ত সম্ভাবনাময় প্রতিভাঘন মানুষ সৃষ্টি করেছিল লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি সেই মানুষ। অনন্য, বহুমুখী ও বৈশ্বিক। তাঁকে জানা তাই কিছুতেই আর ফুরাচ্ছে না। ফুরাবেও না।

প্রবন্ধ

বিকল্প ভাবার এটাই উপযুক্ত মুহূর্ত

ডে ভি ড হা র্ভি

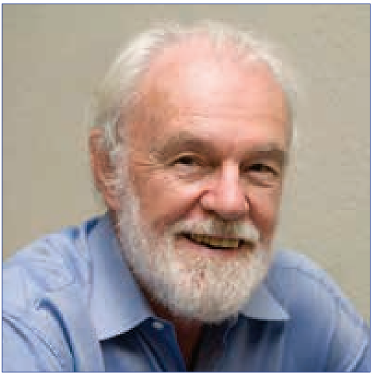

করোনা ভাইরাস গোটা দুনিয়ার সামনে যে সঙ্কট সৃষ্টি করেছে, ঠিক তখনই আমাদের সামনে ভেবে দেখার সময় এসেছে মানবিক স্বাধীনতা বলতে কার্ল মার্কসের ধারণা কী ছিল। এবিষয়ে আলোচনা রয়েছে এই নিবন্ধে। মার্কসবাদী পণ্ডিত এবং সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্কের বিশিষ্ট অধ্যাপক ডেভিড হার্ভির এই প্রবন্ধটি জেকোবিন পত্রিকার ২৪শে এপ্রিল, ২০২০ সংখ্যা থেকে নেওয়া। অধ্যাপক হার্ভি আলোচনা করেছেন এই সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে কী কী জরুরী পদক্ষেপ দরকার এবং সেই সঙ্গে এমন সমাজ গড়া দরকার যা পুঁজির শাসনাধীন নয়।

অনুবাদ : **অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী**

আমি এই লেখা লিখছি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত নিউইয়র্ক শহরে বসে। সময়টা খুব কঠিন। এরকম সময়ে চারপাশে যা ঘটছে সে সম্পর্কে কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানাব সেটাই বুঝে ওঠা যায় না। সাধারণ পরিস্থিতিতে

আমরা যারা পুঁজিবাদবিরোধী তারা রাস্তায় নামি, সমাবেশে যোগ দিই, বিক্ষোভ দেখিয়ে থাকি।

আমি এখন ঘরে একা। এক হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি। অথচ এটা এমন এক সময় যখন আমাদের উচিত ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামা। অবশ্য এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে কাল মার্কসের সেই বিখ্যাত মন্তব্য: আমরা পছন্দমত পরিস্থিতিতে ইতিহাস তৈরি করি না। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে কি করে আমরা পরিস্থিতির সুযোগকে সবথেকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারি।

সত্যি কথা বলতে কি ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক জায়গায় আছি। আমি এখনো কাজ করছি কিন্তু ঘরে বসে করছি। আমি এখনো চাকরি খোয়ায়নি এবং টাকা পাচ্ছি। আমাকে শুধু ভাইরাসের থেকে লুকিয়ে থাকতে হবে।

আমার বয়স আমাকে বিপদজনক ক্যাটাগরিতে ফেলে দিয়েছে, ফলে পাঁচ জনের সঙ্গে মেশা চলবে না। সুতরাং ইন্টারনেটে জুম -এর মাধ্যমে কথাবার্তা চালিয়ে যাবার ফাঁকে ফাঁকে আমার হাতে ভাবার এবং লেখার জন্য অঢেল সময়। এখানে এই নিউইয়র্ক-এ যে পরিস্থিতি তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি তা নিয়ে আলোচনা না করে আমার মনে হয় বিকল্প কি খোলা আছে সে বিষয়ে ভাবা যেতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রশ্নটা হল এই ধরনের পরিস্থিতিতে একজন পুঁজিবাদবিরোধী মানুষ কিভাবে ভাববে?

নতুন সমাজের উপাদান

আমি আলোচনা শুরু করছি মার্কসের একটি ভাষ্য দিয়ে। ১৮৭১ সালে প্যারি কমিউন-এর বিপ্লবী আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর মার্কস লিখেছিলেন “শ্রমিকশ্রেণি কমিউন এর কাছ থেকে কোনো মিরাকল আশা করেনি। সেখানে যে জনগণের ডিক্রি জারি করা হয়েছে তাতে কোনো রেডিমেড ভবিষ্যৎ কল্পনার উপাদান নেই। তারা জানে যে নিজেদের মুক্তির রাস্তা খুঁজে বের করতে এবং বর্তমান সমাজ তার অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে অপ্রতিরোধ্যভাবে নতুন অবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে তার জন্য তাদের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হবে পরিস্থিতি ও মানুষের বদল ঘটাতে ঘটাতে। তাদের সামনে এমন কোন আদর্শ নেই যা উপলব্ধি করতে হবে বরং এই পতনশীল পুরনো বুর্জোয়া সমাজের গর্ভে নতুন সমাজের লক্ষণ

দুর্লভ দৃশ্য। করোনা আক্রান্ত জনহীন নিউইয়র্ক রাজপথ।

দেখা দিয়েছে তাকে বের করে এনে মুক্তি দিতে হবে।”

উপরোক্ত কয়েকটি বাক্য সম্পর্কে আমি এখন কিছু মন্তব্য করতে চাই। প্রথমত ১৮৪০, ৫০, ৬০এর সময়কালে ফ্রান্সে যে বেশ কিছু কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্রীরা ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে মার্কস অবশ্যই যথেষ্ট বিরূপ ছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন চার্লস ফুরিয়ার, হেনরি দ, সেন্ট সিমোঁ অটিয়েন কাবে, লুই আগস্ট ব্ল্যাংকি, পিয়ের জোসেফ প্রুধো প্রমূখ।

মার্কস মনে করতেন এইসব কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্রীরা আসলে স্বপ্নবিলাসী। তাঁরা মোটেই কোন বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন শ্রমিক ছিলেন না, যাঁরা এখানে এবং এখনই শ্রমিকশ্রেণির অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম। যদি এখানে এবং এখনই অবস্থার পরিবর্তন করতে হয়, তবে বুর্জোয়া সমাজের প্রকৃত চরিত্রটি ঠিক কি তা ভালো রকমভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

তবে মার্কস এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলেন যে বিপ্লবী কর্মসূচিকে অবশ্যই মনোনিবেশ করতে হবে শ্রমিকশ্রেণির আত্মমুক্তির দিকে। এই “আত্মমুক্তির” ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি দুনিয়াকে

বদল ঘটানোর বড় কোন পরিকল্পনা হাতে নিতে হয় তবে তার জন্য প্রয়োজন আত্ম পরিবর্তন। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণিকে নিজেকেও পরিবর্তিত করতে হবে। প্যারি কমিউন যখন ঘটে তখন মার্কসের চিন্তার মধ্যে এই ব্যাপারটি ভালো রকম ভাবে ছিল।

যদিও একই সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে প্রকৃতপক্ষে পুঁজি নিজেই পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি করছে, এবং সেটা হবে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সে ক্ষেত্রে সম্ভব হবে নতুন সমাজের বৈশিষ্ট্য গুলিকে "মুক্ত" করার এবং শ্রমিকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা শ্রম প্রক্রিয়ার হাত থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। পুরাতন পতনোন্মুখ বুর্জোয়া সমাজের গর্ভে নতুন সমাজের উপাদান ইতিমধ্যেই রয়েছে, বিপ্লবীদের কাজ হল তাকে মুক্ত করা।

সম্ভাবনার দরজা খুলে দাও

এখন আসুন আমরা এ বিষয়ে একমত হই যে আমরা এক পুরনো পতনোন্মুখ বুর্জোয়া সমাজে বাস করছি। স্পষ্টতই এর গর্ভে অনেক কুৎসিত ব্যাপারও আছে—যেমন বর্ণবিদ্বেষ এবং জেনোফোবিয়া বা বিদেশি মানুষদের সম্পর্কে বিদ্বেষ ও আতঙ্ক—আমিতো এগুলিকে মুক্ত করতে চাই না। মার্কস তো একথা বলেননি যে এই ভয়ানক পতনোন্মুখ বুর্জোয়া সমাজের অভ্যন্তরে যা কিছু আছে সব কিছুকে মুক্ত করে দাও। তিনি যে কথা বলতে চেয়েছেন পতনোন্মুখ বুর্জোয়া সমাজের অভ্যন্তরে সেইসব বিষয়গুলিকে আমাদের মুক্ত করতে হবে যা শ্রমিক এবং শ্রমিকশ্রেণিকে মুক্ত করতে সাহায্য করবে।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল কি সেই সম্ভাবনা এবং কোথা থেকে তা আসবে? মার্কস তাঁর প্যারি কমিউন সংক্রান্ত পুস্তিকার মধ্যে এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেননি, বরং এই পুস্তিকা লেখার অনেক আগে একটি তাত্ত্বিক লেখায় তিনি নিজেকে এই উত্তর খোঁজার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন যে শ্রমিকশ্রেণির সামনে ঠিক কি গঠনমূলক সম্ভাবনা রয়েছে। ১৮৫৭-৫৮ সালের সংকটময় দিনগুলিতে তিনি গ্রুন্ডিজ নামে একটি বিপুল আয়তনের জটিল অসমাপ্ত রচনায় এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। এই রচনায় এমন কতগুলি অংশ আছে যেগুলি পড়লে আমরা আন্দাজ করতে পারব পরে প্যারি কমিউনকে সমর্থন করতে গিয়ে মার্কসের মাথায় কি চিন্তা কাজ করেছিল। এই "মুক্তি দেবার" ধারণা থেকেই বুর্জোয়া পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যন্তরে কি ঘটছে তা

বোঝার চেষ্টা। এইটা বোঝার জন্য মার্কস বরাবর সংগ্রাম করেছেন।

গ্রুন্ডিজ রচনায় মার্কস প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে যে সহজাত প্রযুক্তিগত গতিশীলতা রয়েছে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। মার্কস দেখিয়েছেন যে পুঁজিবাদ তার সংজ্ঞা অনুসারেই উদ্ভাবন, নতুন প্রযুক্তিগত নির্মাণ এবং তার সাংগঠনিক সম্ভাবনার বিষয়ে বেশি মাত্রার বিনিয়োগে দায়বদ্ধ। তার কারণ একজন ব্যক্তি পুঁজিপতি হিসেবে আমার সঙ্গে অন্য আরেকজন পুঁজিপতির প্রতিযোগিতা থাকে এবং আমার প্রতিপক্ষের চেয়ে আমার নিজের প্রযুক্তি যদি উন্নত হয় তাহলে আমি বাড়তি মুনাফা পাবো। তাই একজন ব্যক্তি পুঁজিপতির মধ্যে সবসময়ই এই আকুতি থাকে প্রতিপক্ষ সংস্থার চাইতে উন্নত উৎপাদনশীল প্রযুক্তি খুঁজে বের করার।

তাই পুঁজিবাদী সমাজের একেবারে অভ্যন্তরে এই প্রযুক্তিগত গতিশীলতা একেবারে জুড়ে বসে আছে। কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার রচনার সময়কাল থেকে (১৮৪৮ সালে লিখিত) মার্কস এই বিষয়টিকে নজর করা শুরু করেন। পুঁজিবাদের এই যে অন্তর্নিহিত শক্তি এর থেকেই বোঝা যায় কেন পুঁজিবাদের একটা স্থায়ী বিপ্লবী চরিত্র আছে।

সে কখনোই তার চালু প্রযুক্তি নিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকবে না। সে সব সময়ই চাইবে তার উন্নতি ঘটাতে কারণ উন্নত প্রযুক্তি যার থাকবে সেই ব্যক্তি সেই সংস্থা এবং সেই সমাজ সবসময় পুরস্কৃত হবে। যে রাষ্ট্র, জাতি অথবা শক্তি গোষ্ঠীর হাতে সবথেকে আধুনিক এবং গতিশীল প্রযুক্তি রয়েছে তারাই ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবে। সুতরাং পুঁজিবাদের বিশ্বায়িত কাঠামোর মধ্যে যুক্ত রয়েছে প্রযুক্তিগত গতিশীলতার বিষয়টি।

প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন

এ বিষয়ে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের আলোকিত করে এবং তা যথেষ্ট আকর্ষণীয়। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের প্রক্রিয়াটি অনুমান করতে গিয়ে আমরা সচরাচর এইটা কল্পনা করি যে কেউ একটা নিজের প্রয়োজন মেটাতে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে থাকে। অর্থাৎ প্রযুক্তিগত গতিশীলতা যেন কোনো একটা নির্দিষ্ট কারখানা একটা নির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থা এবং এক বিশেষ পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য।

সহমর্মিতা। করোনা আক্রান্ত নিউইয়র্ক শহরে খাদ্য বিতরণ।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য প্রযুক্তি উৎপাদনের এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। তারা জেনেরিক হয়ে দাঁড়ায়। যেমন কম্পিউটার প্রযুক্তি যে কেউ যে কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে। যে কোনো মানুষ এবং যে কোনো শিল্পের ব্যবহারের জন্য অটোমেশন প্রযুক্তি পাওয়া যায়।

মার্কস লক্ষ্য করলেন ১৮২০,১৮৩০,১৮৪০ এর ব্রিটেনে নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার ইতিমধ্যেই একটি স্বাধীন ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। তখন আর ব্যাপারটা এমন নয় যে বস্ত্র শিল্প অথবা অন্য কোন শিল্পে কোন আগ্রহী মানুষ নিজের মতো করে নতুন প্রযুক্তি এনে নিজের ওই শ্রমিক দিয়েই বেশি উৎপাদন করছে। বরং শিল্পোদ্যোগীরা এমনভাবে নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসছে যা সর্বত্র ব্যবহৃত হতে পারে।

মার্কসের সময়কালে এর সবথেকে বড় উদাহরণ ছিল স্টিম ইঞ্জিন। তখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্টিম ইঞ্জিনের প্রয়োগ ঘটেছে তা সে কয়লা খনি থেকে ময়লা জল নিষ্কাশন এবং রেল রুট তৈরি করা অথবা বস্ত্রশিল্পের তাঁতযন্ত্র চালানো যাই হোক না কেন। তাই আপনি যদি উদ্ভাবনের ব্যবসায় লগ্নি করতে চান তবে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেশিন শিল্পে কাজ শুরু করাই সবথেকে ভালো।

এইভাবে বার্মিংহাম শহরের মত জায়গায় একটা গোটা অর্থনৈতিক এলাকা গড়ে উঠেছিল যার বিশেষ দক্ষতা ছিল যন্ত্রাংশ তৈরিতে– তা পরে শুধু নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেনি নতুন উৎপাদন শুরু

করেছিল। মার্কসের সময়কালে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নিজের অধিকারে একটি স্বাধীন ব্যবসায় পরিণত হয়েছিল।

স্থিতাবস্থা নয়, অবিরত দৌড়

মার্কস তাঁর গ্রুন্ডিজ রচনায় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন যে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন যখন ব্যবসায় পরিণত হয় তখন তা কোন এক নির্দিষ্ট চালু বাজারের নতুন প্রযুক্তির চাহিদা মেটানোর পরিবর্তে নতুন বাজার তৈরি করে। সুতরাং পুঁজিবাদী সমাজের গতিশীলতায় নতুন প্রযুক্তি হয়ে দাঁড়ায় এক ধারালো হাতিয়ার।

এর পরিণাম সর্ব ব্যাপক। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই যে প্রযুক্তি কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না: তারা কখনো এক জায়গায় থিতু হয় না এবং দ্রুত সেকেলে হয়ে পড়ে । নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলানো পরিশ্রম সাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষও বটে। কোনো একটা চালু সংস্থার পক্ষে পুরনো প্রযুক্তি বাতিল করা ধ্বংসাত্মক হয়ে দাঁড়ায়।

তা সত্ত্বেও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন ইলেকট্রনিক্স ফার্মাসিউটিক্যালস বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের জন্য উদ্ভাবন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যারাই নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারবে, মানুষের কল্পনা যে করায়ত্ত করতে পারবে, যেমন সেলফোন অথবা ট্যাবলেট অথবা কম্পিউটার চিপ-এর মত নানাবিধ প্রায়োগিক দিক সেগুলিই এই অবস্থায় জয়ী হবে। তাই প্রযুক্তি নিজেই যে একটি ব্যবসায় পরিণত হলো সেটাই মার্কস তার আলোচনার একেবারে কেন্দ্রে নিয়ে এলেন পুঁজিবাদী সমাজ কি তা বোঝাতে গিয়ে।

এখানেই পুঁজিবাদের সঙ্গে অন্যান্য উৎপাদন পদ্ধতির তফাৎ। উদ্ভাবনের ক্ষমতা মানবজাতির ইতিহাসের সূচনা পর্ব থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রাচীন চীনে এমনকি সামন্ততন্ত্রেও প্রযুক্তির পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অনন্য বৈশিষ্ট্য এটাই যে এখানে প্রযুক্তি একটা ব্যবসায় পরিণত এবং একটি জেনেরিক উৎপাদন হিসেবে উৎপাদক অথবা যে কোনো গ্রাহকের কাছে বিক্রি করা যায়।

এটি পুঁজিবাদের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। এটি হলো অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি যার দ্বারা পুঁজিবাদ বিবর্তিত হয়। এই পৃথিবীতেই

আমরা বাস করছি তা আমাদের পছন্দ হোক বা না হোক।

যন্ত্রের অনুষঙ্গ

এসব অগ্রগতি লক্ষ্য করে মার্কস কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন। প্রযুক্তি যাতে ব্যবসায় পরিণত হয় সেজন্য কিছু ক্ষেত্রে নতুন ধরণের জ্ঞান চর্চার প্রয়োজন দেখা দিল। এইভাবে গোটা দুনিয়ার সামনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি একটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিষয় হিসেবে উঠে এল।

বাস্তবের মাটিতে নতুন প্রযুক্তির সৃষ্টি হল এবং সেটাই সমন্বিত হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নামক উদীয়মান বৌদ্ধিক ও একাডেমিক চর্চার সঙ্গে। মার্কস লক্ষ্য করেছিলেন কিভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বাস্তবায়ন এবং নতুন ধরনের জ্ঞান হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ বৈপ্লবিক প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ল।

এর মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির যে চরিত্র তার আরেকটি দিক সংজ্ঞায়িত হল।

প্রযুক্তিগত গতিশীলতা যুক্ত হলো নতুন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান উৎপাদনের সঙ্গে কখনো কখনো তা যুক্ত হলো গোটা দুনিয়ার বৈপ্লবিক মানসিক ধারণার সঙ্গে। নতুন জ্ঞান ও বোঝাপড়ার উৎপাদন ও সম্প্রসারণ এর জালে আটকা পড়ল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্র। ক্রমান্বয়ে এম আই টি ক্যাল টেক এর মত সম্পূর্ণ নতুন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো এই অগ্রগতি কে আরও ত্বরান্বিত করতে।

মার্কস এরপর প্রশ্ন তুললেন: এর ফলে পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ঠিক কী ঘটল এবং তা কিভাবে শ্রম (এবং শ্রমিক) কে এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলল? প্রাক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, ধরা যাক ১৫ এবং ১৬ শতাব্দীতে সাধারণভাবে উৎপাদনের উপকরণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির উপর শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং তারা এইসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে উঠেছিল। বিশেষ ধরনের জ্ঞান বিশেষ ধরনের বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে এইসব দক্ষ শ্রমিকদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব এসে গিয়েছিল এবং মার্কস দেখিয়েছেন এগুলোকে সবসময়ই শিল্প বলে গণ্য করা হতো।

কিন্তু যখনই কারখানা এসে গেল বিশেষ করে আজকের পৃথিবীতে ব্যাপারটা আর তা নেই। শ্রমিকদের ট্রাডিশনাল দক্ষতা আজ অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তার জায়গা

দখল করে নিয়েছে। নতুন ধরনের জ্ঞান হিসেবে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান যুক্ত হয়েছে যন্ত্রের সঙ্গে, ফলে শিল্প অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এই প্রসঙ্গে আপনার যদি আগ্রহ থাকে তবে মার্কসের গ্রুন্ডিজ রচনাটির ৬৫০ থেকে ৭১০ পৃষ্ঠা (পেঙ্গুইন সংস্করণ) পড়ে দেখতে পারেন এবং সেখানে মার্কস অবাক করে দেওয়ার মত কথা লিখেছেন। তিনি দেখিয়েছেন নতুন প্রযুক্তি এবং জ্ঞান আজ যন্ত্রের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ: আজ তা আর শ্রমিকের মস্তিষ্কে নেই, আজ শ্রমিক একদিকে কোণঠাসা, সে নিছকই যন্ত্রচালক। যাবতীয় বুদ্ধি এবং যাবতীয় জ্ঞান যতদিন শ্রমিকের ছিল যা পুঁজির পাশাপাশি তাকেও কিছুটা একচেটিয়া কর্তৃত্ব দিত, আজ তা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

যে পুঁজিপতির একসময় এই দক্ষতার প্রয়োজন ছিল সে আজ সেই সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত এবং দক্ষতা আজ যন্ত্রে আবদ্ধ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে যে জ্ঞানের উদ্ভব হচ্ছে তা চলে যাচ্ছে যন্ত্রে এবং যন্ত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে পুঁজিবাদী গতিশীলতার “আত্মা”। এই পরিস্থিতি মার্কস বর্ণনা করেছেন।

শ্রমিকের মুক্তি

পুঁজিবাদী সমাজের গতিশীলতা অত্যন্ত বেশি রকম নির্ভর করে আছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে ধারাবাহিকভাবে নতুন উদ্ভাবন হচ্ছে কিনা তার উপর। মার্কস তাঁর নিজের সময়কালে এটি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। ভাবতে পারেন তিনি এই বিষয়গুলি নিয়ে লিখেছিলেন ১৮৫৮ সালে! কিন্তু আজ ঠিক এই মুহূর্তে আমরা এমন এক পরিস্থিতিতে যেখানে এই বিষয়টি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মার্কস সেদিন যে কথা বলেছিলেন তারই আজকের সমকালীন বিষয় হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা সংক্ষেপে এ আই)। আমাদের জানা প্রয়োজন এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে কতটা উন্নত হয়েছে এবং কি পরিমাণে তা উৎপাদনে প্রযুক্ত হচ্ছে (অথবা হতে পারে)। এর অনিবার্য পরিণতি হলো শ্রমিকের কর্মচ্যুত হওয়া এবং প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে একজন শ্রমিকের যে কল্পনাশক্তি দক্ষতা অভিজ্ঞতা সবকিছু নিরিখেই শ্রমিক আরো বেশি নিষ্ক্রিয় মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

এ বিষয়ে মার্কস গ্রুন্ডিজ-এ নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন। সেটি

আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি কারণ আমি মনে করি এই মন্তব্য সত্যি সত্যি অবাক করে দেওয়ার মত:

"সহজ সরল শ্রমপ্রক্রিয়া থেকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদনের যে রূপান্তর ঘটছে এর ফলে প্রকৃতির শক্তি পদানত হচ্ছে তাকে বাধ্য করা হচ্ছে মানুষের প্রয়োজনে খাটতে এবং জীবন্ত শ্রমিকদের জায়গা নিচ্ছে স্থায়ী পুঁজি—শ্রমিক এর যাবতীয় শক্তি আরোপ করা হলো পুঁজির শক্তির উপর।"

অর্থাৎ যন্ত্রের অভ্যন্তরে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে তা এখন পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণে। সুতরাং যখন উৎপাদন ও ভোগের প্রয়োজন হবে তখন পুঁজিই হয়ে দাঁড়াবে আমাদের সম্মিলিত জ্ঞানের বাহক। শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা চলে গেল স্থায়ী পুঁজির হাতে, যা শ্রমিকের হাতের বাইরে। শ্রমিক হয়ে গেল কোণঠাসা। সুতরাং যখন উৎপাদন ও ভোগের প্রশ্ন আসছে তখন স্থায়ী পুঁজি হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের সম্মিলিত জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার বাহক।

সেইসঙ্গে মার্কস তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন পতনোন্মুখ বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে সেই সম্ভাবনার প্রতি যা শ্রমিকদের বিরাটভাবে সাহায্য করবে। এবং সেটা হলো এই: পুঁজি—"একরকম অনিচ্ছাকৃতভাবেই মানবিক শ্রমকে কমিয়ে দেয়, এনার্জি ব্যয় কমিয়ে দেয় একেবারে ন্যূনতম করে দেয়। "এইটাই মুক্ত শ্রমিকের সুবিধা হয়ে ফিরে আসে এবং এটাই হলো তার মুক্তির শর্ত।" অর্থাৎ মার্কসের মতে অটমেশন অথবা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মত ব্যাপারগুলি শ্রমিকের মুক্তির পরিস্থিতি ও সম্ভাবনা তৈরি করে।

অবাধ বিকাশ

প্যারি কমিউন বিষয়ক পুস্তিকা থেকে আমি মার্কসের যে উদ্ধৃতি দিলাম তা দেখলে বোঝা যায় শ্রম এবং শ্রমিকের আত্মমুক্তির বিষয়টি এখানে কেন্দ্রীয় আলোচ্য হিসেবে উঠে এসেছে। এটা এমন এক ব্যবস্থা যেটা সাদরে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু সেটি কি এমন পরিস্থিতি যা মুক্তি এনে দেবার সম্ভাবনায় পূর্ণ?

উত্তরটা খুব সহজ। এই যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এত প্রসার ঘটছে এর ফলে শ্রমের সামাজিকীকরণ ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন শ্রমিক যে এইসব যন্ত্রের দায়িত্বে সে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ পণ্য উৎপন্ন করতে পারে। এই প্রসঙ্গে মার্কস গ্রুন্ডিজ রচনায় ফের

কি বলেছেন দেখা যাক:

যে পরিমাণ বৃহৎ শিল্প বিকশিত হয়, প্রকৃত সম্পদের সৃষ্টি তত শ্রম সময় ও শ্রমের পরিমাণের উপর কম নির্ভর করে, বরং তা ঠিক হয় ওই শ্রম সময় এর মধ্যে বিভিন্ন গতিশীল যন্ত্রের শক্তির উপর, এর,"শক্তিশালী কার্যকারিতা" উৎপাদনে প্রত্যক্ষ শ্রম, সময়ের উপর নয়, বরং নির্ভর করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির উপর অথবা উৎপাদনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ এর উপর.... প্রকৃত সম্পদ যেখানে আত্মপ্রকাশ করে, বলা চলে বৃহৎ শিল্প তা তুলে ধরে কতটা সময় ব্যবহার করা হয়েছে আর তা থেকে যে উৎপন্ন দ্রব্য বেরিয়ে এসেছে উভয়ের মধ্যে দৈত্যাকার অসঙ্গতিকে।

এরপর মার্কস সেই সময় কার এক রিকার্ডিয়ান সমাজতন্ত্রীর লেখা উদ্ধৃত করে বলছেন "একটি জাতিকে সত্যিই সম্পদশালী বলা যায়, যদি সেখানে কাজের সময় ১২ ঘণ্টা নয় বরং ৬ ঘণ্টা হয়ে থাকে। উদ্বৃত্ত শ্রম ও সময় এর উপর কর্তৃত্ব করানোকে সম্পদ বলে না... বরং প্রত্যক্ষ উৎপাদনের পর একজন ব্যক্তি তথা গোটা সমাজের হাতে কতটা সময় উদ্বৃত্ত আছে তাই দিয়েই বিচার হয়।"

এইভাবে পুঁজিবাদ "ব্যক্তি মানুষের স্বাধীন বিকাশ"এর সম্ভাবনাকে তৈরি করে, যার মধ্যে শ্রমিকরাও আছে। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, যে কথা আমি আগেও অনেকবার বলেছি তা হল: মার্কস বারে বারে একটা কথ বলেছেন: ব্যক্তি মানুষের স্বাধীন বিকাশ। সুতরাং সাধারণভাবে ধারণা আছে যে মার্কস ব্যক্তি মানুষের বিকাশকে চাপা দিয়েই মানুষকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার কথা বলতেন তা মার্কস সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা।

বরং উল্টোটাই সত্যি। মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা বলেছেন যাতে ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। এই বিষয়টি নিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি আলোচনায় ফিরে আসছি। কিছু এক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এর অবাধ বিকাশের সম্ভাবনা একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় শ্রম

এ সম্পর্কে গোটা আলোচনাটাই দাঁড়িয়ে আছে যে বিষয়টির উপর তা হল "প্রয়োজনীয় শ্রমের সাধারণ হ্রাস প্রাপ্তি" অর্থাৎ একটা সমাজের দৈনন্দিন জীবনকে চালাতে গেলে কি পরিমাণ

শ্রমের প্রয়োজন হয়। শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর অর্থ হল সমাজের মৌলিক চাহিদা মেটানো যাবে। এর ফলে ব্যক্তি মানুষের হাতে পর্যাপ্ত বাড়তি সময় থাকবে এবং সেই মুক্ত মানুষের শৈল্পিক ও প্রাযুক্তিক বিকাশ ঘটবে।

গোড়ার দিকে এই সময় হাতে পাবে কিছু সুবিধাভোগী শ্রেণি কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রতিটি মানুষের হাতে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার মত বাড়তি সময় থাকবে। অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তি ইচ্ছামত যা করতে চায় তাই করবে, এই বিষয়টি হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আধুনিকতা ও প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

মার্কস বলছেন সমস্যা এইখানে যে পুঁজি নিজেই হল একটি ‘‘চলমান দ্বন্দ্ব’’। পুঁজি একদিকে শ্রম ও সময় কমিয়ে ন্যূনতম করে ফেলতে চেষ্টা করে আবার অপরদিকে সম্পদের একমাত্র মাপকাঠি ও উৎস হিসেবে গণ্য করে শ্রমসময়কেই। এইভাবে শ্রম সময় তার প্রয়োজনীয় আকৃতি অর্থাৎ যেটা সত্যিই প্রয়োজন সেটা হারায় এবং একটি প্রয়োজনের অতিরিক্ত আকৃতি ধারণ করে।

এইযে প্রয়োজন অতিরিক্ত আকৃতি এটা কি মার্কস বলছেন উদ্বৃত্ত মূল্য। প্রশ্ন হল কে এই উদ্বৃত্ত করায়ত্ত করবে? মার্কস যে বিষয়টি চিহ্নিত করছেন তাহল এই উদ্বৃত্ত পাওয়া যাচ্ছে না এমন নয় কিন্তু তা শ্রমিক পাচ্ছে না। কারণ তার প্রবণতাই হল ‘‘একদিকে উদ্বৃত্ত সময় তৈরি করা’’ এবং অন্যদিকে সেটিকে পুঁজিপতি শ্রেণির সুবিধার্থে ‘‘উদ্বৃত্ত শ্রম’’এ পরিণত করা।

প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারটিকে শ্রমিকের মুক্তির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে না অথচ তা করা যেত। এই বিষয়টিকে কাজে লাগানো হচ্ছে পুঁজিপতিদের বাসায় পালক গোঁজার জন্য এবং বুর্জোয়াদের হাতে থাকা প্রচলিত পদ্ধতিতে সম্পদ পুঞ্জীভূত করার জন্য।

এখানে আসছে প্রধান প্রধান দ্বন্দ্ব। মার্কস এর প্রশ্ন: ‘‘সত্যি কথাই বটে। একটা দেশের সম্পদ কতটা তা আপনি কি দিয়ে বিচার করবেন?’’ তিনি বলছেন ‘‘বাজারে কত টাকা খাটছে আর বাকি কতটা কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে আছে তাই দিয়ে।’’ কিন্তু আমরা আগেই দেখলাম মার্কস বলছেন ‘‘একটা সত্যিকারের সম্পদশালী দেশ তাকেই বলা যাবে যেখানে ১২ ঘন্টার পরিবর্তে ৬ ঘন্টা কাজ করতে হয়। সম্পদ বলতে এটা বোঝায় না উদ্বৃত্ত সময়ের উপর

কতটা কর্তৃত্ব আছে বরং গোটা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন মিটিয়ে কতটা বাড়তি সময় হাতে আছে।”

অর্থাৎ একটা সমাজ কতটা সম্পদশালী তা বিচার করা হবে কতটা উদ্বৃত্ত স্বাধীন সময় আমাদের দেওয়া হচ্ছে তাই দিয়ে। সেই সময়ে বিনা বাধায় আমরা ইচ্ছামত যা খুশি তাই করতে পারি কারণ আমাদের মৌলিক চাহিদা মিটে গেছে। এক্ষেত্রে মার্কসের যুক্তি হলো আমাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে হবে সেই রকম সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে। তবে এ ক্ষেত্রে বাধা হল সমাজের প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণী সম্পর্ক এবং পুঁজিবাদী শক্তির প্রয়োগ।

এই লকডাউন এর মধ্যে

এখন এই সবকিছুর একটা ইন্টারেস্টিং প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন করোনা ভাইরাসের কারণে লকডাউন হয়েছে এবং অর্থনীতি ধসে পড়েছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে এমন এক অবস্থার মধ্যে পড়েছি যে আমাদের হাতে অঢেল বাড়তি সময় রয়েছে।

আমরা কাজে বেরোতে পারছি না; স্বাভাবিক কাজকর্ম যা কিছু করার তা করতে পারছি না। এই বাড়তি সময় আমরা করবটা কি? বাড়িতে যদি একটা বাচ্চা ছেলে থাকতো তাহলে অবশ্যই অনেক কাজ থাকত করার। কিন্তু আমরা এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যখন সত্যিই হাতে অঢেল সময়।

দ্বিতীয় বিষয়টি অবশ্য এই যে আমরা এখন গণহারে বেকারত্ব লক্ষ্য করছি। সর্বশেষ তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে আমেরিকা থেকে ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষের কাজ গেছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে এ হলো বিপর্যয়। হ্যাঁ অবশ্যই এটা বিপর্যয় কারণ আপনি যখন আপনার কাজ খোয়াচ্ছেন তখন আপনি সুপার মার্কেটে গিয়ে কেনার মাধ্যমে পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা হারাচ্ছেন হারাচ্ছেন, কারণ আপনার হাতে পয়সা নেই।

বহু মানুষ তাদের স্বাস্থ্যবীমা হারিয়েছেন, এবং বহু মানুষ তাদের বেকারত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা পেতে অসুবিধায় পড়েছেন। আবাসনের অধিকার এখন ডামাডোলের মধ্যে কারণ ভাড়া অথবা বন্ধকী রেখে টাকা ধার যাই বলুন না কেন কিস্তি বাকি পড়ে যাচ্ছে। মার্কিন জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সম্ভবত প্রায় ৫০

সকলের জন্য গৃহের দাবিতে নিউইয়র্ক এর মিছিল।

শতাংশ পরিবার যাদের ব্যাংকে ৪০০ মার্কিন ডলারের বেশি বাড়তি অর্থ নেই যা দিয়ে ছোটখাটো জরুরী পরিস্থিতি সামলানোর যায়, আর এখন তো আমরা পুরোদস্তুর বড় সংকটের মধ্যে।

এক নতুন শ্রমিকশ্রেণি

এইসব মানুষগুলো খুব শীঘ্রই খোলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে তাদের এবং তাদের শিশুদের চোখেমুখে ক্ষুধার ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু আসুন সমস্যাটাকে আরেকটু গভীরভাবে দেখা যাক।

ক্রমশ বাড়তে থাকা অসুস্থ মানুষদের যারা দেখভাল করবে অথবা যারা ন্যূনতম পরিষেবা দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের পুনরুৎপাদনকে বজায় রাখবে সেই শ্রমজীবী মানুষ অবধারিতভাবেই এক বিশেষ লিঙ্গ এক বিশেষ বর্ণ এবং এক বিশেষ জাতির মানুষজন। সমকালীন পুঁজিবাদের একেবারে সামনের সারিতে থাকা এরাই হলো "নতুন শ্রমিকশ্রেণি"।

এদের দুটো বোঝা বইতে হয়: এরা হলো সেই শ্রমিক যারা তাদের কাজের কারণে সব থেকে বেশি ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে আবার এই ভাইরাসের কারণেই অর্থনৈতিক সংকটের ফলে যে ছাঁটাই হচ্ছে তারও শিকার এরাই।

বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণি তা প্রধানত আফ্রিকান আমেরিকানরা, লাতিনো এবং চুক্তিবদ্ধ মহিলারা,এদের সামনে দুটি ভয়ঙ্কর বিকল্প খোলা আছে, মানুষের সেবা করতে গিয়ে সংক্রমণের আশঙ্কা এবং বিশেষ ধরনের পরিষেবায় (যেমন মুদিখানার দোকান)একই ধরনের বিপদ আর এর বিকল্প হচ্ছে সম্পূর্ণ বেকারি এবং সম্পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকা (যেমন পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা না পাওয়া)।

অনেকদিন ধরেই শ্রমজীবী মানুষের এই বাহিনী সমাজের সঙ্গে মিশে আছে নয়া উদারনীতি র আজ্ঞাবাহী প্রজা হিসেবে, অর্থাৎ বিপদ কিছু ঘটলে এরা নিজেদের অথবা ভগবানকে দোষ দেয়, কখনো সাহস করে এ কথা বলে না যে পুঁজিবাদই হয়তো সমস্যার মূল কারণ। কিন্তু এইসব নয়া উদার নীতির এইসব অনুগত প্রজারা আজ দেখতে পাচ্ছে এই মহামারীর ব্যাপারে কোথাও কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে যার ফলে গোটা সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তারাই বিপুল বোঝা বইতে বাধ্য হচ্ছে।

নতুন করে শুরু করা

করোনাভাইরাস কে কেন্দ্র করে গুরুতর সংকট তৈরি হয়েছে তার থেকে বেরিয়ে আসতে সম্মিলিত কার্যক্রম দরকার। করোনা মোকাবিলায় যে লকডাউন বা সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স শুরু হয়েছে এসব থেকেও তো আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম প্রয়োজন কারণ যাতে আমরা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি হিসেবে ইচ্ছা মত বেঁচে থাকার স্বাধীনতা লাভ করি, আজ এই মুহূর্তে আমরা তা করে উঠতে পারছিনা।

সেই সঙ্গে এই হলো একটা সুযোগ যখন আমরা বুঝে নিতে পারি পুঁজি কাকে বলে। এর অর্থ হলো আমরা এমন একটা সমাজ তৈরি করছি যেখানে আমরা বেশিরভাগ মানুষ যা চাই তা করতে পারিনা কারণ আমরা নিজেরাই দায়িত্ব নিয়েছি পুঁজিপতি শ্রেণির সম্পদ তৈরি করার।

মার্কস বেঁচে থাকলে হয়তো বলতেন, আচ্ছা, এই ২কোটি ২৬লক্ষ বেকার মানুষ, এরা যদি নিজেদের পেট চালানোর মত পর্যাপ্ত অর্থ রোজগার করতে পারে, থাকার জন্য ঘর ভাড়া করতে পারে, বেঁচে থাকার জন্য পণ্য কিনতে পারে তাহলে যে কাজ তাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছে সেই কাজ থেকে গণহারে মুক্তির জন্য চেষ্টা করে না কেন?

ঘুরিয়ে বলতে গেলে,আমরা কি এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসবো শুধু এই কথা বলে যে এই ২কোটি ৬০ লক্ষ মানুষের কাজ ফিরে পেতে হবে, এরমধ্যে সেই বিরক্তিকর কাজগুলো রয়েছে যা তারা এত বছর ধরে করে আসছে? এই ভাবেই কি বর্তমান পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসবো আমরা? অথবা আমরা এ প্রশ্ন করব:এ ছাড়া

কি অন্য কোন উপায় আছে যার সাহায্যে আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস উৎপন্ন করতে পারব এবং পরিষেবা দিতে পারব, যেখানে সকলেই দুমুঠো খেতে পাবে, সকলেই ভদ্রসভ্যভাবে বসবাস করতে পারবে, উচ্ছেদ হওয়াকে চিরতরে বন্ধ করতে পারবো? এটাই কি সেই মুহূর্ত নয় যখন আমরা একটা বিকল্প সমাজ গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করব?

আমাদের যদি ভাইরাস মোকাবিলার মতো যথেষ্ট তাকৎ, বুদ্ধি থাকে তাহলে আমরা একই সঙ্গে পুঁজির মোকাবিলা করতে পারব না কেন? সংকটের আগে যেমন ছিল ঠিক সেইরকম কাজে আমরা আবার যোগ দেবো এই কথা না বলে হয়তো আমরা বলতে পারি:আমরা কেন একটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলে এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসবো না?

এই বর্তমান পতনশীল বুর্জোয়া সমাজের ভিতর যে সম্ভাবনার উপাদান রয়েছে—সেগুলিকে মুক্তি দিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং সাংগঠনিক কাঠামো কে কাজে লাগিয়ে আমরা কি সত্যিই একেবারে অন্যরকম কিছু করতে পারিনা যা আগে কখনো ছিল না?

বিকল্পের আভাস

অন্ততপক্ষে এই জরুরি পরিস্থিতির মধ্যে আমরা ইতিমধ্যেই সব ধরনের বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি, গরিব মহল্লা ও গরিব জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনামূল্যে ন্যূনতম খাদ্য দেওয়া থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিকল্প কাঠামোতে প্রবেশ ইত্যাদি কাজ আমরা করছি। প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যেই নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের অবয়ব আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে—সম্ভবত সেই কারণে দক্ষিণপন্থী এবং পুঁজিপতি শ্রেণি খুবই উদ্বিগ্ন নিজেদের স্থিতাবস্থা ফিরে পেতে।

বিকল্পে চেহারাটা কেমন হবে সেটা ভাবার এটাই উপযুক্ত মুহূর্ত। এটাই একটা মুহূর্ত যখন বিকল্পের এর বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে। যা মনে এলো তার ভিত্তিতে ‘‘আমরা এক্ষুনি ২ কোটি ২৬ লক্ষ কাজ ফেরত চাই’’ ওহ্ কথাটা না বলে আমাদের ভাবা উচিত একটি সম্মিলিত সাংগঠনিক উদ্যোগের যা শুরু হয়েছে এবং প্রসারিত হতে পারে।

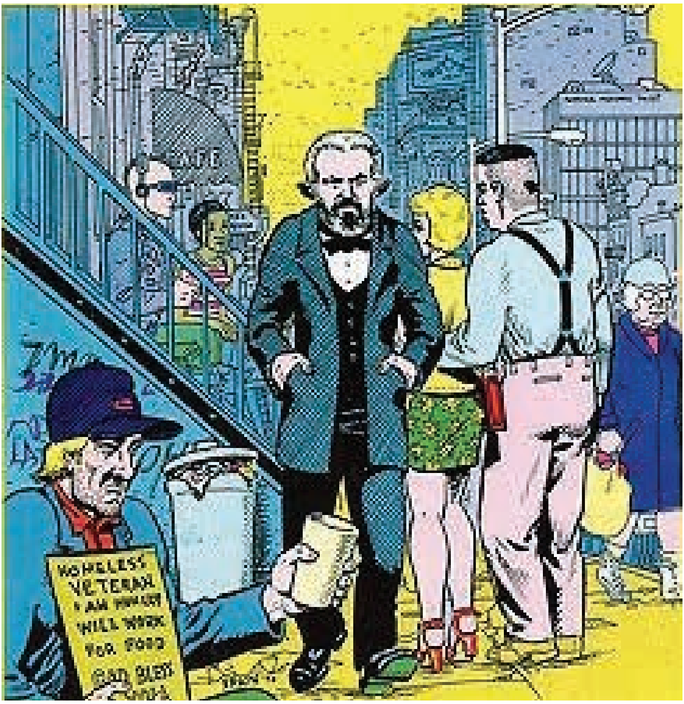

নিউইয়র্কের রাস্তায় পথ হাঁটছেন কার্ল মার্কস। শিল্পীর কল্পনায়। এক সমকালীন বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে।

এটা ইতিমধ্যেই ঘটছে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে, শুরু হয়েছে খাদ্য সরবরাহ ও রান্না করা খাবারের সামাজিকীকরণ এর মধ্য দিয়ে। এই মুহূর্তে নিউইয়র্ক শহরে বেশ কিছু রেস্টুরেন্ট খোলা আছে সেখানে মানুষ কিছু দান করেছে বলে তারা বিরাট অংশের বেকার মানুষদের যাদের পক্ষে কাজ যোগাড় করাও সম্ভব নয় তাদের বিনামূল্যে খাবার দিচ্ছে।

শুধু এ কথা বললে চলবে না "এখন জরুরি পরিস্থিতি এ কাজ তাই করছি।" বরং এই সেই মুহূর্ত আমরা সেই রেস্টুরেন্টকে বলতে পারি তোমাদের আদর্শ হলো জনসাধারণকে খেতে দেওয়া যাতে সকলের দিনে অন্তত একবার বা দু'বার ভালো করে খেতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক উদ্ভাবন

আমাদের সামনে সেই সমাজের বেশ কিছু উদাহরণ আছে: বেশকিছু বিদ্যালয় নিয়মিত মিড ডে মিল দেয়। এগুলি চালিয়ে যেতে দিতে হবে যা থেকে মানুষ আন্দাজ করতে পারবে যত্নবান হলে আমরা কি করতে

পারি। এটাই কি সেই মুহূর্ত নয় যখন আমরা সমাজতান্ত্রিক উদ্ভাবনা কে কাজে লাগিয়ে বিকল্প সমাজ গড়তে পারি?

এ কোন অলীক কল্পনা নয়। আপার ওয়েস্ট সাইড এর রেস্টুরেন্ট গুলোর দিকে তাকান, এখন সেগুলি বন্ধ হয়ে আছে। কিন্তু এখানেই রয়েছে সম্ভাবনা। এখানে যে লোকগুলি কাজ করত তারা ফিরে আসুক, রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো অথবা ঘরে ঘরে অভুক্ত বৃদ্ধদের খাবার তৈরি করা শুরু করুক।আমরা যাতে মুক্ত স্বাধীন হতে পারি সেজন্যই এই সম্মিলিত উদ্যোগ দরকার।

যদি এই ২ কোটি ৬০ লক্ষ বেকার মানুষ কাজে ফেরত যায় তখন তাদের ১২ ঘণ্টার পরিবর্তে ৬ ঘন্টা কাজ করলেও চলবে, তখন আমরা একটা অন্য বোঝাপড়ায় পৌঁছাব। বিশ্বের সবথেকে ধনী দেশের মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার মানে কি আমরা বুঝতে পারবো। হয়তো এই ভাবেই আমেরিকার সত্যিকারের গ্রেট হয়ে উঠবে (সেই এগেইন শব্দটা ডাস্টবিনে পচবে)।

এই বিষয়টাই মার্কস বারে বারে প্রতিবারে বলেছেন: সত্যিকারের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা ও মুক্তি আসা সম্ভব যেখানে সবাই একসঙ্গে হয়ে ৬ ঘন্টা খাটলে সকলের প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা হয় তারপর বাকি সময়টা যে যেমন ভাবে চায় সেভাবে কাটাতে পারে, অপরদিকে বুর্জোয়া মতাদর্শ প্রতিনিয়ত যে মুক্তির কথা বলছে তা হল একটা মেকি মুক্তি।

পরিশেষে বলতে চাই এটাই কি সেই ইন্টারেস্টিং মুহূর্ত নয় যেখানে আমরা একটা বিকল্প ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের গতিশীলতা ও সম্ভাবনা নিয়ে সত্যিকারের ভাবতে পারি? এই ধরনের মুক্তি দায়ক পথের সন্ধান পেতে সর্বাগ্রে আমাদের নিজেদের মুক্ত করতে হবে, যাতে আমরা নতুন বাস্তবতার পাশাপাশি আমরা নতুন স্বপ্ন দেখতে পারি।

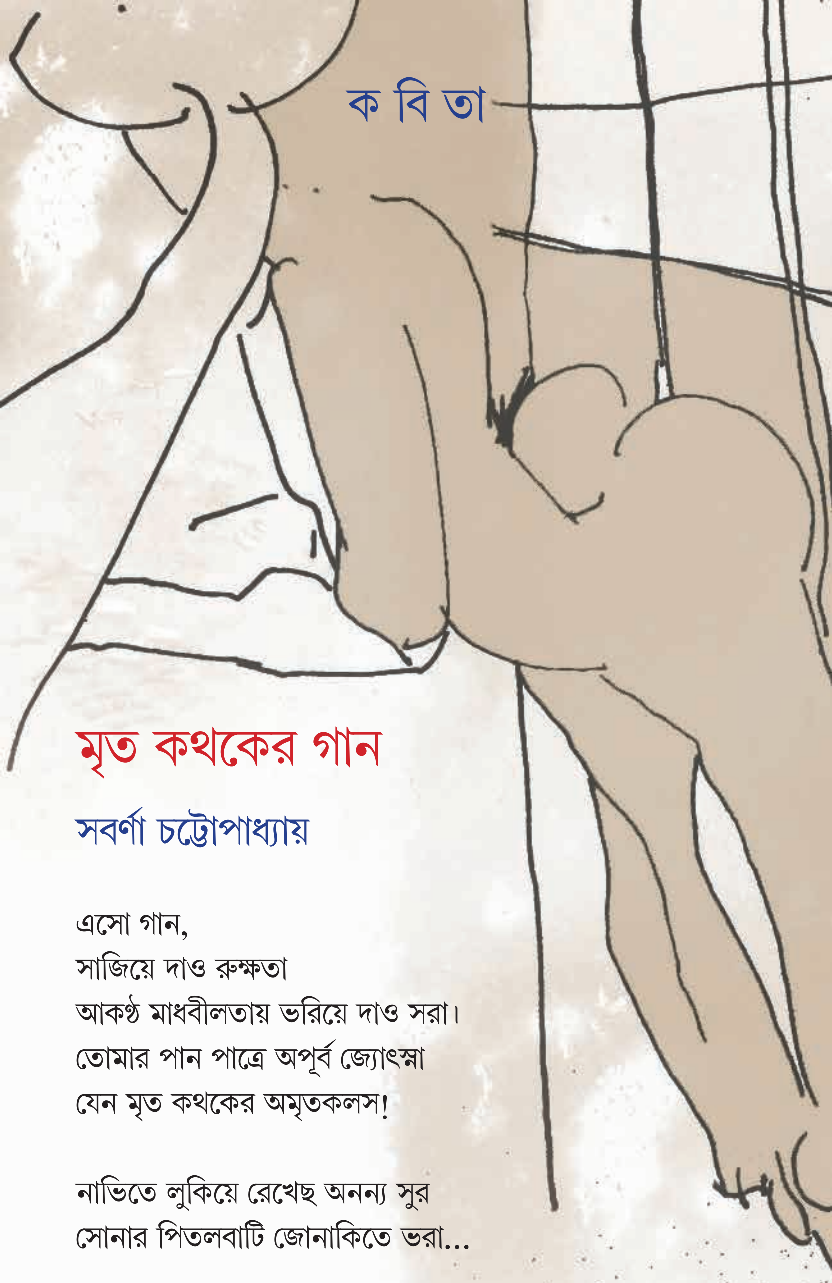

মৃত কথকের গান

সবর্ণা চট্টোপাধ্যায়

এসো গান,
সাজিয়ে দাও রুক্ষতা
আকণ্ঠ মাধবীলতায় ভরিয়ে দাও সরা।
তোমার পান পাত্রে অপূর্ব জ্যোৎস্না
যেন মৃত কথকের অমৃতকলস!

নাভিতে লুকিয়ে রেখেছ অনন্য সুর
সোনার পিতলবাটি জোনাকিতে ভরা...

এ পথ শুধু আমাদের নয়
রোদের কার্নিভাল
কাঁপা কণ্ঠ ভরে ওঠো
নিখাদ ব্যর্থতায়!

২

চারদিকে জোনাকি আলো
একমুঠো জ্বেলে দাও।
তারাদের দেখা হোক আবার
দুদিকে মহাকাশ দূরত্ব আর ধূমকেতু ছুট,

স্তব্ধতা ভাঙছে সুরে
গুঞ্জনে শুনি ভ্রমর এসেছে বুঝি!
যে হাহুতাশ ঘিরে ছিল কবিতার পাতায়
আমার রক্তে, শিরায়, উপশিরায়
কেঁপেছে যেন ধী...

মৃত শরীর ছুঁয়েছে সে বায়ু
অক্ষরে অক্ষরে আত্মহত্যা সেরেছি প্রতিবার।
নীরব রক্তপাতের পর শরীরজন্ম।
হায় বাতাস!
তোমাকে নিয়ে গেছে শুধু তস্কর সেজে...

৩

পুড়িয়ে দিয়েছ কতকাল হল মৃত পাথরের স্তূপ,
আমি লিখি তার ইতিহাসটুকু শহর যখন চুপ।
ভুলেছে যেমন স্মৃতিকথা নয়, হাজার অসুখে সুখী
আমরা তো নই সহজ পাঠক, হৃদয় যাপনে দুখি।

জটিল ভীষন শিশিরবিন্দু ঘাসের শরীর যেন
জাগছে প্রশ্ন তোমাকে ছাড়াই বছর কাটছে
কেন?
সহস্রবার আমরা মরেছি সহস্রবার বাঁচা,
দিনের জঠরে দুলছে যেমন শূন্য পাখির খাঁচা।

আমরা জটিল শিশিরকণায় সুপ্ত দুখানি কুঁড়ি,
আবার কখনো দেখা হয় যদি, তোমায় চিনতে পারি!

৪

স্বরলিপিহীন আগস্ট। মে'র গদ্য শেষ হয়নি যেন,
একাকী যাপন ছেড়ে পাখিদের কোলাহলে বাঁচি।
হাসপাতালের গন্ধ আসে, ঘরে!

ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে সময়। বলিরেখা কাঁপে
আয়নার ভুল হয়না কোনদিন
দুটো সাপ ওঠানামা করে।

মনের ভেতর কত জল। প্রতিচ্ছবি,
ঢিল পড়ে, সুতোয় টান দেয় কেও।

প্রতিটা অভুক্ত রাত একটা করে খিদে
একটা করে মৃত্যুর মুখোমুখি
অমাবস্যার চাঁদ আর আগুন...

পুড়তে পুড়তে চড়চড় শব্দ হয়!

৫

মাটিতে পেতেছি কান, মৃত্যুর কফিনে কত তারা
উথল সাগর ঢেউ, এতকাল কাছে ছিল যারা!
ঝিনুক ছড়িয়ে যেও, শরীরের ভাঙাচোরা খোলে
কি হবে এমন রাত, আঁধারের পূর্ণতা না হলে?

পুরোনো প্লেয়ারখানি সযত্নে আড়ালে রাখা বুঝি
তবে এই ভাদ্রে কেন মিছোমিছি বারিষকে খুঁজি?
শহর ভুলেছে কবে, ফকিরের কেঁপে ওঠা গান
বিবাগী বিকেলজুড়ে চড়ুইয়ের কাক ভেজা স্নান!

অসুখের শেষ কবে? বেলা দেখো পড়ে এল বুঝি
খরার শরীরে আজো মিছোমিছি বারিষকে খুঁজি।

নিপুণ প্রসাধনে

বিকাশ চন্দ

অক্ষত ছিল না আমার পুরানো হৃদয়ের প্রত্যয়
চতুর্দিকে অনাঘ্রাত পাশব শ্বাস–
প্রান্তিক জীবন তার পথ ছিল বড় মায়াময়,
কেবল ঘরে ফেরা রাস্তা উধাও।
যে হৃদয়ের উষ্ণতায় প্রতিদিন বেড়ে ওঠা–
হঠাৎই নির্দয় বরফ কাল উসকে দিল ঠাণ্ডা ঘর।

সবই ঠিক ছিল জল ছলছল উদাস নদী স্রোত–
অকস্মাৎ সব ঈশ্বরের হাজারো দোসর ধুনিজালে,
বেপথু ভগীরথ আজ পথ ভোলা লক্ষ্যহীন পথে–
জড়িয়ে রয়েছে চতুর্দিকে নিরীহ বংশধর শেকড়ে বাকড়ে
চরাচর বিছিয়ে শান্তি আর সবুজের আঁচল,
হঠাৎই যেন জোয়ার এসেছে সবই ভাসিয়ে নেবার
আহা বিষাদের রাত! দেখো বেঁচে আছি সমস্ত ঢেউ ভেঙে!

গাছে গাছে সবুজ আস্তরণ ফুল ফল পাখি–
পাখির পিঠে তেমনই দু'টো ডানা বুকের ওমে বাঁচে তার ছানা,
এভাবেই প্রতিদিন আত্মসমর্পণ সুগভীর বিশ্বাসে।
পাখিদের কল কাকলি সানন্দে আসে নেই চেনা সুন্দর ছন্দ লয়–
পাঁজরের টনটন ছুঁয়ে আরও উষ্ণতম শান্তি জল ভাঙে,
কেউ বলেনি ক্রীতদাস হও বা নাগরিক দ্বিতীয় শ্রেণী –
কেমন আছি দেখুন নিপুণ প্রসাধনে গোপণ গেরুয়া সুনীলে।

কবিতা শঙ্খ

নাসির ওয়াদেন

রাত্রি নিগড় নিঝুম
ভোরের পুষ্পে পাখির জাগরণ ভাঙাঘুম

বৈদেহিক জীবনের ছায়ারেখা
সমান্তরাল পথ বেয়ে বেয়ে সামনে বক্রলেখা

যে তরু বিলিয়ে আসে সহস্র স্নেহকণা
আজকে বড় অসহায় সে তো, ছেদনে ছেদনে শূন্য বিছানা

যে আশায় ভাষা জুড়ে ছিল প্রাণ
ভস্মে ঘি ঢেলে প্রমাণ দিলে তুমি কত বড়ো বেইমান

হাজার হাজার শ্রম জুড়ে ফলিত সুবর্ণ রাশি
ভাগ করে খায় মুষ্টিমেয় আমার হাতে ধর্মের ভাঙা রাশি

অবশেষে রাত্রির অবসান নতুন সূর্যের
গরল প্রভাতে অরুণ কিরণ সময়পাখির ধৈর্যে।

অভিসম্পাত

উৎপল রায়

আমি ছুঁতে পারছি না তোমাকে
মাঝখানে দাঁড়িয়ে কালান্তক।
তোমার বিষাদের আঁকিবুকি
আড়াল করেছে রাঙা মুখোশ।

হয়তো বা খুশিতে পড়া টোল
বন্ধুর চোখে ঝিলিক তোলে না
মনের যা কিছু দৃশ্যমানতা
হচ্ছে না সেইসব বিনিময়।

নিত্য আসে ভয়াল জাদুকর
স্বস্তিতে নেই একদম জেনো
অকৃত্রিম মুখোশ যার মুখ
গামছায় ঢাকাঢাকি, কী গেরো!

লুটছে জাদুকর শুষে নিচ্ছে
তোমারই তো যাপন অর্জন
ওর পতাকায় যে লেগে আছে
আখলাখের লঙ্কেশের রক্ত।

জেগে থাকো, দেখো তাঁবু কাঁপবে
জামলোর মা'র অভিসম্পাতে।
জাদুকর জেদি, তবু বাতিল
লাস্ট আইটেম নররাক্ষস।

বসন্তবৌরি

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

রোজকার ধ্বস্ত জীবনে শুধুই আকাঙ্ক্ষার টানাপড়েন,
তার মাঝখানে
ফোটে এক-একদিন মায়াবি ভোর–
শরীর থেকে খসে পড়ে পিচ্ছিল অন্ধকার,
পর্ণমোচি বৃক্ষের বাকলের মতো।

মহৎ দুঃখের সুবাতাস ছড়িয়ে যায়,
হয়তো কোথাও কখন ডেকে ওঠে বসন্তবৌরি।

পালাবদল হয় এই প্রত্ন শহরের –
ময়দানের গা ছুঁয়ে ছুটে যাওয়া বাস,
মৃত্যুর বিষবাষ্প দুরারোগ্য ভয় দেখায়।

খদ্দের চুক্তি করা সাঁঝবেলার যান্ত্রিক মেয়েমানুষ,
অমোঘ এক ভয়ের টানে মুখে আবরণ টানে–
শিরশির করে জৈব ব্যাধির মতো অদেখা মৃত্যু

ভয়ের পিছুতাড়া খাওয়া মানুষ ঘরে ফেরে,
প্রায়ান্ধকারে দৈবী শান্তিজল ছড়ায় প্রত্যাশার বসন্তবৌরি।

বরিষ্ঠ

অনুপ মণ্ডল

পৌষের সে রাতে
আমরা বুড়ো ক'জন
আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসে তামাশা দেখছিলাম
পোড়া সূর্যটা ভেতরে ভেতরে কাঁচা তখনও
আর আমরা একটা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে
তার আধপোড়া সকালটাকে উসকাচ্ছিলাম
ফণা নামাতে নামাতে লেলিহান শিখা
প্রহরের মধ্যে তার মনিহীণ মাথাটা
গুঁজে দিতে চাইছিল বারবার।

এবং এর বিপরীতে
অনেক যুক্তিজাল অনেক কূটতর্ক
অনেক কমা পুর্ণচ্ছেদ ও সেমিকোলন যদিও
তবু কাহিনির মধ্যস্থতায় মৃত্যুভয় এড়িয়ে
অবশেষে ডিম পাড়ল সময়

নীল রঙের। আকাশ নীল হল
আকাশের নিচে
আকাশের নীল ওমে তাকে ফুটতে দেওয়া হল

এক আকাশ কান্নার
সাতরঙা রামধনু হয়ে
ডিমটা ফুটে বেরুলো আজ।

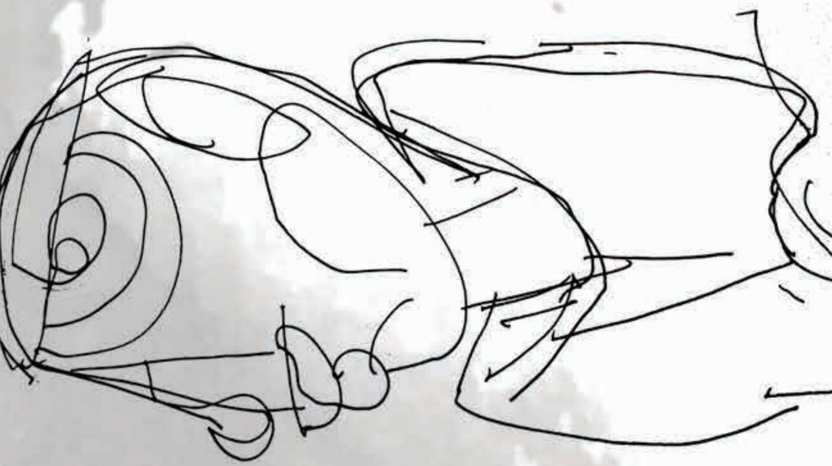

কষ্ট করে মেঘ লিখি

গোপেশ রায়

কষ্ট করে মেঘ লিখি তাই
ঢাকা পড়ে যায় চাঁদ তারা আরো কিছু মনোব্যথা
জীবনের থালায় সাজাই বীজধান গুটিকয়েক
সর্ষে ফলাই
এত দিনের বেহিসাবি চলাফেরা আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়
সাগর কথার উৎপত্তিস্থল
হিংসাকে কতটুকু প্রশ্রয় দিলে কেবলমাত্র বিপ্লবের কথা
বলা যায় আগুন কথায়
রোদ চাই, বারুদ চাই, বারুদমাখা
চাই কিছু টগবগে রক্তের মাঝি মল্লার
যারা সারারাত দাঁড় টানতে টানতে আমাকে পৌঁছে দেবে
স্বপ্নের ঠিকানায়।

জোয়াল পুরুষ

স্বপ্ননীল রুদ্র

প্রতীক-প্রিয় শিল্পীর আঁকা রহস্য-ছবির মতো
কাঁধে জোয়াল লাগানো বাবা স্থির হয়ে খাদ্যমাঠে–

প্রথম বিঘায় চষা শেষ, টেনেটুনে বীজবস্তা
নিয়ে আসছে আমার কচি কচি চার চারটি কাকা,
আলের পরে ফসল বেঁধেছেঁদে নিচ্ছে দুই পিসি
প্রতিবেশি গাছের তলায় ঠাকুরদার ও ঠাকুমার
হাসির জানালা ধরে, বাবা দেখছে, দাঁড়িয়ে রয়েছে
স্বর্ণশীতল ছায়ার দ্যুতি–মনোরম ঠাণ্ডা তৃপ্তি...

উল্লেখযোগ্য মজুরি নয়, তবুও অমোঘ টানে
সফল ধনুকের ছিলার মতন আগ্রাসী হয়ে
জমিতে দাঁড়িয়ে থাকে কাঁধ-উঁচু জোয়াল-পুরুষ–
অব্যর্থ নিশানা নিয়ে খাদ্যভাণ্ডারের বাঁধা-মুখ
ছিন্ন করে খুলে দেয় বাবার প্রক্ষেপ-তির, ওঠে
হড়পা বানের মতো শস্য-ঢেউ, ছিটকে ভেসে যায়
ক্ষেতকেন্দ্রিক জীবন, এ ছবির পরিধির বাইরে...

ক্যানভাসে বাবাকে শুধু অবোধ্য প্রতীক মনে হয়।

তবুও তোমাকে চাই

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

তবুও তোমাকে চাই, জানি তুমি স্বর্ণমৃগ খাসা,
তোমাকে বরণ করলে নেমে আসে পদে পদে ক্ষয়,
জীবন ছারখার হয়, প্রতিক্ষণ শুধু পরাজয়,
ধীরে ধীরে বাকরুদ্ধ হয়, আর লোপ পায় ভাষা
তবুও তোমাকে চাই, ভেঙে যাক সব স্বপ্ন আশা,
আসুক আসুক নেমে সমস্ত রকম বিপর্যয়,
কালিমায় লিপ্ত হোক আমার কাজের পরিচয়,
আমার জীবনবৃত্ত হোক মিথ্যা বিশেষণে ঠাসা।
তুমি চাও ঘরে ঘরে আসুক প্রশান্তি স্বাস্থ্য সুখ,
শোষণ পেষনহীন অপ্রমত্ত বলিষ্ঠ সমাজ,
তুমি চাও ধর্ম জাতি নিয়ে ভেদাভেদ দূর হোক।
হায়! তা বাস্তবায়িত করতে গেলে কামান বন্দুক
নিয়ে তেড়ে এসে ওরা তোমার উপরে হানবে বাজ।
তবুও তোমার সঙ্গী হয়ে কষ্ট সইব সর্বাত্মক।

বুকলেট

শ্রীনিবাস অধিকারী

এখন আর আমি কারও ভালবাসাটাসা নই, নই ফাঁকা হৃদয়ের কেউ
কাউকে কোত্থাও আর না বিরহ শোনাব, না আর ভুলে ও প্রেমটেম।
আমি যতটা না আজ দ্রোহের, জেনো তার চেয়ে খাঁটি অনেক বেশি
ফ্যানাভাতের গন্ধে পেটের বুড়বুড়ি-তোলা আগুনের, হরিমোটর ভরা
হাঁড়ি ও থালাবাসনবাটির পাশে পড়ে থাকা খালি আসনের, বারোমাস
হাঁ-জিরজিরে মুখের, দিন আনি তবু জোটেনি-র একদরিয়া খিদের।

খেটে খাওয়া সে বাজার এখন মন্দা, সৎ-শ্রম কিনতে চায় না কেউ
সবাই আশিরনখ দরদাম করে দিনরাত খালি বিক্‌কিরি হতেই বলে।

ওরা জানে না আমি মানে এক হৃদয় টগবগ-করা ভালবাসা, একবুক
তাজা হাওয়া আমাকে কেনা মানে এক-আকাশ স্বপ্ন আঁকার হাতে
শক্ত রশির বেড়ি, দিগন্তঘেরা ঘাস মাটিদের প্রেমগাথাভরা এক পৃথিবী
শেকড়বাকড় থেকে সহজ বিস্তারের বিশ্বাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলা

তাই, যতই আমার নামে বাতিল তকমা জুড়ে, দূর ছাই করে ছুঁড়ে
দেবে দূর ভাগাড়ে কিম্বা নর্দমার দুর্গন্ধে, আস্তাকুঁড়ের জঞ্জাল-স্তূপে

অগাধ ক্ষতর রক্তবুলেট ফুঁড়ে ততই জেনো পতপত করে উড়বে
অক্ষত এক নিঃস্ব হাওয়ার অমার্জিত নিশান— উদ্ধত যত বুকলেট।

অলঙ্করণ : সুব্রত দাস

গল্প

বিদেশী পাখি

ঋভু চট্টোপাধ্যায়

সৌমেন্দু গ্যারেজের চাবিটা খুলতেই একবার বাঁদিকটাতে তাকালো। বোসকাকুর বাড়ি না! এই সময় তো পাড়াটাতে এত লোক থাকে না। এতদিন এই পাড়াটাতে আসছে, দিনে হোক বা সন্ধেবেলা, পাড়াটাতে কেউ কারোর সাথে মেশে না। কথাগুলো মনে এলেও আর বেশি এইসব কথা চিন্তা না করে রাস্তা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। যাক এখনো কেউ আসেনি, এলেই সব বসা নিয়ে ঝামেলা করতে আরম্ভ করবে। আসলে ওদেরও দোষ দেওয়া যায় না। এতবড় গ্যারেজও মাত্র

একটা টেবিল ফ্যানেরই অ্যারেঞ্জ করতে পেরেছে, তাও একটা টিনের চেয়ারে বসিয়ে রাখা আছে, কোনও দিকেই এখন আর ঘোরে না। সোজা যে বসতে পারে সেই হাওয়া পায়, না হলে ঘেমে মরে। কখনো কখনো নিজেই উঠে নিজের মত ফ্যানটা ঘুরিয়ে নেয়। মাঝে মাঝে কয়েক জন চেল্লায়ও খুব। এই তো কয়েকদিন আগেই ক্লাস নাইনের প্রিয়াঙ্কা বলেই দিল, 'স্যার আপনি খুব কিপটে, কবে থেকে একটা ফ্যান কিনতে বলছি শুনছেনই না।' সৌমেন্দু আর তাকে বলতে পারেনি, মাসের প্রথমে আর কিছু হোক আর না হোক বাবার ওষুধের জন্য মায়ের হাতে আগে পাঁচটি হাজার টাকা তুলে দিতে হয়, তারপরে তো সংসার খরচ আলাদা। আসলে টিউশনের তো কোন নির্দিষ্ট দিনে মাইনের ব্যবস্থা নেই তাই অসুবিধা হয়ই। কিছু টাকা আগে থেকে আপদ বিপদের জন্যেও রাখা থাকে। মাসের শেষে মাঝে মাঝে এমন অবস্থা হয় যে সিগারেট কেনারও পয়সা থাকে না। তবে একটা ভরসা আছে, একটা চাকরি পাকা হয়ে আছে, কোর্ট কেসের জন্য এই মুহুর্তে নিয়োগটা হয়নি। সৌমেন্দু এইসব ভাবতে ভাবতেই গ্যারেজের মেঝেতে একটা শতরঞ্জি পেতে বাইরে দাঁড়াতেই কয়েকজন ছাত্র এসে গেটের কাছে সাইকেল রাখতে রাখতে বলে উঠল, 'স্যার শুনেছেন, ঐ বুড়োটা মরে গেছে।'

সৌমেন্দু অবাক হয়, 'কোন বুড়ো?'

—সেই যে এদিক দিয়ে পেরিয়ে যাবার সময় আপনাকে একবার 'কি মাস্টার' বলে ডেকে যেতেন।

সৌমেন্দুর এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। ঐ জন্য ওখানটাই কয়েকজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন।

—তোকে কে বলল?

—আমি তো ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম।

সৌমেন্দু একবার ভিড়টার দিকে দেখে গ্যারেজের ভিতর ঢুকল। বাকি ছাত্রছাত্রীরা একে একে ভিতরে যাওয়ার পরেও সৌমেন্দু পড়ানো আরম্ভ করেনি। তবে বেশ কয়েকজন পেমেন্ট দিল, সৌমেন্দু প্রতিবারের মত সবাইকে পেমেন্টের খাতাতে মাস, এমাউন্ট, ডেট সব লিখিয়ে একবার গুনে নিল। চার হাজার। বাবার টেস্টগুলো হয়ে যাবে। বাবার রিটায়ার্ডমেন্টের পর টিউশনির এই পেমেন্টগুলোই যা ভরসা, তাও ভগবানের আশীর্বাদে এই অঞ্চলে পড়ানোতে সৌমেন্দুর খুব নাম। কয়েক বছর ধরেই বেশ ভালো রেজাল্টের পাশে অনেকেই

ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চান্স পেয়েছে। কিন্তু আজ পড়ানোতে ঠিক মন এল না। শেষ কবে বোসকাকুর সাথে দেখা হল। ও গত বৃহস্পতিবার। গ্যারেজের পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাবার সময় প্রতিবার সৌমেন্দুকে দেখতে পেলেই, 'কি মাস্টার?' বলে কিছুক্ষণ দাঁড়াতেনই। গত বৃহস্পতিবারেও দাঁড়িয়ে কথা বলেছিলেন। অবশ্য কথা বললে তার বেশিরভাগটাই ছেলের কথাই থাকত।

সৌমেন্দুর কয়েকমাস আগের কথা মনে এল। পড়াতে পড়াতে কোনও কারণে খুব ঘুম আসবার জন্যে বাইরে চা খেতে বেরিয়েই প্রথমবার ভদ্রলোকের সাথে দেখা হয়। সৌমেন্দুকে দেখে একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেন, 'এই পাড়াতে আগে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না, কোথায় থাকা হয়?'

—আমি এই পাড়াতে থাকি না, পড়াতে আসি।

—পড়াতে! কাদের বাড়ি?

—কারোর বাড়ি নয় আমি একটা রুম ভাড়া নিয়ে পড়াই, বাইরের স্টুডেন্ট আসে।

—কাদের বাড়ি?

—ঐ আচার্যকাকুদের, রুম মানে গ্যারেজটা ভাড়া নিয়েছি।

—অ, ভিড় দেখি। তা কোন সাবজেক্ট পড়ানো হয়?

—ফিজিক্স।

—ফিজিক্স! চাকরি বাকরি জোটেনি নাকি?

—একটা চাকরি পেয়ে আছি এখনো কাউন্সেলিং হয়নি, কেস হয়ে আছে।

—কেস তো, ও হবে না।

—যতদিন না হয় ততদিন টিউশন করে যেতে হবে।

—আমার ছেলের নাম শুনেছ? এ পাড়াতে সবাই চেনে। বিদেশে থাকে, কয়েক বছর জার্মানিতে আছে, তার আগে ফ্রান্সে ছিল। আইআইটি, ফাস্ট বারেই চান্স পেয়েছিল। এখন কত বেতন জানো, কোনো ধারনা নেই তোমাদের।

—না আমি ধারণা করতেও চাইছি না। ঠিক আছে আসি আসি, স্টুডেন্টরা বসে আছে তো।

এরপরেও যতবার দেখা হয়েছে ঘুরেফিরে সেই এক কথা ছেলে ছেলে আর ছেলে। তবে আজ সব শুনে সৌমেন্দু একবার গ্যারেজের বাইরে বেরিয়ে মাকে ফোন করে বাবার কথা জিজ্ঞাসা করতে মা

একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, 'এরকম তো কোনদিন জিজ্ঞেস করিস না, কিছু হয়েছে?'

আমতা আমতা করে সৌমেন্দু পুরো ঘটনা বলতেই মাও একটু বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল, 'ওরকম ছেলের মুখে আগুন, বাবা-মাই তো বড় করেছে, শেষ জীবনটা ছেলেমেয়ে না দেখলে কে দেখবে?'

একজন বাদে সব ছাত্রছাত্রী এসে গেছে। সৌমেন্দু আর কথা না বাড়িয়ে আস্তে আস্তে পড়ানো আরম্ভ করল। এক ছাত্রী ভদ্রলোকের মারা যাবার কথা শুনে বলে উঠল, 'স্যার ঐ বুড়োটা মরেছে তো? বেশ হয়েছে, খালি আপনাকে পিন করে কথা শোনাতো।'

কথাগুলো সত্যি হলেও বাবার বয়সি একজন এরকমভাবে মারা যাওয়ার ঘটনা খুব দুঃখজনক, ছাত্রীটিকে বকলো। কিন্তু সৌমেন্দুর পড়ানোতে মন এল না। থার্মোডায়নামিক্সের কয়েকটা প্রবলেম দিয়ে গ্যারেজের বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখল বাড়িওয়ালা আচার্য কাকু সেই সময়ে বাড়িতে ঢুকছেন। সৌমেন্দুকে দেখে বলে উঠলেন, 'দেখেছো, কি রকম সমস্যা, সুস্থ সবল মানুষ, আজ শুনছি মারা গেছেন।'

—কি হয়েছিল কিছু বোঝা গেল?

—কিভাবে বুঝবো, ওনার মিসেস তো কয়েক বছর আগেই গত হয়েছেন। একমাত্র ছেলে সে বাবু এখন বিদেশে। একটি মেয়ে প্রতিদিন সকালে এসে একবেলা রান্না করে যেত, তাই দু'বেলা খেত। কোনদিন রাতে হোম ডেলিভারির থেকে খাবার নিত। ঐ রান্নার মেয়েটাই এসে দেখে দুদিনের পেপার দরজার বাইরে পড়ে আছে, একদিন নাকি মেয়েটি আসতে পারেনি, তবে সব রান্না ফ্রিজে রেখে গেছিল। আজ এসে কয়েকবার ডাকার পর সাড়া না পেয়ে পাড়ার লোক ডাকে। এখন দেখি ডাক্তার আসে, নাকি পুলিশ এসে বডি নিয়ে যায়।

—আর কোনও আত্মীয়স্বজন নেই?

—এটা ঠিক জানি না, তবে পাশের বাড়ির রায়বাবু বলছিলেন কে নাকি এক বোন আছে, মাঝে মাঝে আসেও, কিন্তু পুলিশ না এলে তো কিছু বলা যাবে না।

—পুলিশ এখনো আসেনি?

—না গো, আজ কোথায় একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, থানাতে ফোন করা হয়েছিল, আসতে একটু দেরি হবে বলল। সৌমেন্দু আর

কিছু না বলে একটা লম্বা শ্বাস ফেলল। আচার্য কাকু বাড়ির ভিতরে চলে গেল সৌমেন্দু আস্তে আস্তে গেটের বাইরে এসে দেখল ভিড়টা একটু পাতলা হয়েছে। মোড়মাথাতে একটা চায়ের দোকানে সৌমেন্দু চা বিস্কুট খেতে গেল। দোকানটাতেই বোস কাকুর সাথে প্রথম আলাপ হয়। তারপর মাঝে মাঝেই কথা হতো। সৌমেন্দু দোকানির থেকেও কিছু খবর পেল। ফিরে আবার গ্যারেজের ভিতর ঢুকতে যাবে এমন সময় দেখে ঘর থেকে আচার্য কাকু খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসছেন। সৌমেন্দুকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করবার আগেই বলে উঠলেন, 'কাউন্সিলার এসেছেন, তাই সবাই ডাকছে। দেখি পুলিশ আর কাটা ছেঁড়াটার হ্যাপাটা আটকানো যায় কিনা?'

সৌমেন্দু, কাকুর রাস্তা ছেড়ে গ্যারেজটাতে ঢুকে প্রবলেমগুলো চেক করতে আরম্ভ করল। কিছু সময় পরে আচার্য কাকু বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে সৌমেন্দুকে দেখে বলে উঠলেন, 'পুলিশের ঝামেলাটা মিটল বুঝলে, আমাদের কাউন্সিলার নিজের দায়িত্বে সবকিছু ব্যবস্থা করলেন। পাশেই এক ডাক্তার বাবু থাকেন উনিই ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দেবেন।'

—ওনার আত্মীয়স্বজনদের ফোন করলেন, ঐ যে কে বোন আছে বলছিলেন।

—ও তো অনেক দূরে থাকে, আসতে পারবে না, জানিয়ে দিল।

—আর ওনার ছেলে।

—ওকেও ফোন করা হয়েছিল, আসবে না, তবে টাকা পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেবে বলেছে। কাজকর্মের যাতে কোন ত্রুটি না হয় সে ব্যাপারটাও দেখতে বলেছে। কিন্তু মুশকিল হল এত দূর থেকে সবকিছু কিভাবে সামলাবে, কিভাবে টাকা পাঠাবে, কারোর অ্যাকাউন্টে অতগুলো বিদেশী টাকা পাঠানোও সম্ভব নয়। কিন্তু এখানেও বা কে কাজকর্ম করবে। ধর আজকেই গাড়িভাড়া, পুরোহিত, দশকর্মা, তারপর চুল্লির খরচ, সব মিলে হাজার তিন, কে দেবে? তাছাড়া একটু-আধটু শ্রাদ্ধ শান্তিও করতে হবে পাড়া থেকে কিছুটা না হয় চাঁদা তোলা হবে, কাউন্সিলার কিছু দেবেন বললেন, কিন্তু বাকি? সেটা কে দেবে? আবার আরেকটা সমস্যাও আছে, একজন গরিব মানুষ মারা গেলে তার কাজের জন্য লোকে দু-এক টাকা দেবে কিন্তু বোসদার জন্য কেউ কেন দেবে? আমরাও বা কাউকে কিভাবে বলব? যার ছেলে বিদেশে থাকে, মাসে যার কয়েক লক্ষ টাকা রোজগার তার কিনা পারলৌকিক কাজ হচ্ছে

পাড়ার লোকের কাছে চেয়ে চিন্তে, এটা খুব ভাবনার ব্যাপার।

সৌমেন্দু সব কথাগুলো একভাবে শুনতে শুনতে বাবার কথা মনে পড়ল। ও নিজেও একমাত্র ছেলে, বাড়ির অবস্থা ভালো নয়, কিন্তু নিজেও মা বাবাকে ছেড়ে চাকরি নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবার ব্যাপারে ভাবতে পারেনি। এই কথাগুলো শুনে আবার বোসকাকুই একদিন হেসে হেসে বলে উঠেছিলেন, 'তুমি একটা বোকা ছেলে, এই দেশে কিছু আছে নাকি, বিদেশে যাও, এই তো বয়স, দু'হাতে রোজগার কর, তবে তো ভবিষ্যৎ তৈরি করতে পারবে? অর্থাৎ ভবিষ্যৎ মানে শুধু টাকা রোজগার?

'এই দ্যাখো, আবার মোবাইলটা ভুললাম।' কথাগুলো বলেই আচার্যকাকু তাঁর নিজের বাড়ির ভিতর যেতেই সৌমেন্দু সব ছাত্রছাত্রীদের ছেড়ে গ্যারেজের চাবি দিয়ে বাইরের গেটে দাঁড়াতেই আচার্যকাকু তাড়াতাড়ি নেমে বোসকাকুর বাড়ির দিকে যেতেই পিছন থেকে সৌমেন্দু বলল, 'কাকু, একটা কথা বলছিলাম, আমি যদি ওনার জন্য কিছু টাকা দি, নেবেন?'

—আচার্যকাকু একটু চমকে উঠলেন, 'তুমি দেবে! কেন?'

—আসলে কাকু আমার সাথে খুব কথা বলতেন, কাকিমার কথা, ওনার ছেলের কথা সব আলোচনা করতেন, আমার খুব খারাপ লাগছে।

—ঠিক আছে তোমার যখন এতই ইচ্ছে, যা পারো দাও।

সৌমেন্দু পকেট থেকে সেদিনের ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া পেমেন্টের টাকাগুলো বের করে আচার্যকাকুর হাতে দিয়ে বলল, 'এই যে কাকু।'

—কত দিলে গো?

—চার হাজার টাকা, এর মধ্যে আজকের খরচ আশা করি হয়ে যাবে।

আচার্য কাকু কিছুসময় চুপ থেকে বলে উঠলেন, 'কিন্তু তোমার বাবাও তো অসুস্থ, তাঁর ওষুধের খরচা সামলানো যাবে তো?'

—সে আপনি ভাববেন না, আপনাদের আর্শীবাদে সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে কাউকে কিছু বলবেন না। আপনারা এগোন আমিও যাচ্ছি, কাকুকে তো আর কোনদিন দেখতে পাবো না।

আচার্য কাকু আরো কিছু বলতেন কিন্তু ততক্ষণে বোসকাকুর ঘরের সামনে দাঁড়ানো সবাই বলে উঠলেন, 'আচার্যদা আসুন এবার তো বেরোতে হবে।'

সৌমেন্দু বাইকটা স্টার্ট করতে যাবে এমন সময় মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। পকেট থেকে বের করেই দেখল, 'মা কলিং।'

অলঙ্করণ : চঞ্চল খান

কামালদা

প বি ত্র স র কা র

১

বিশেষভাবে বাংলাদেশের তো বটেই, কিন্তু সমগ্রভাবে বাঙালি জাতির জন্যও এই করোনা নানা দুঃসংবাদ তৈরি করছে। অবশ্যই তা একটা বিশ্বগত বিপর্যয়। যেখানে তিন লক্ষের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ নানা বঞ্চনা আর দুর্গতির শিকার হয়েছেন সেখানে ব্যক্তিগত আর গোষ্ঠীগত শোক হয়তো গণিতের হিসাবে বেশি গুরুত্ব পাওয়ার কথা নয়। তবু আমাদের চিরকালের স্বভাবই এই যে, যে মৃত্যু দূরের এবং অপরিচিতের তাকে আমরা আমাদের দখল করতে দিই না। কিন্তু যে মৃত্যু কাছের এবং পরিচিতের, তাকে নিয়ে আমরা আলোড়িত থাকি। আর পরিচিতের মধ্যে যদি কেউ এমন থাকেন যে, যিনি আত্মীয় না হলেও তাঁর সঙ্গে একটা আত্মীয়ের মতো বন্ধন তৈরি হয়েছিল, আর শুধু তাই নয়, দেশ আর জাতির রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনেও তাঁর ভূমিকা ছিল অতিশয় মূল্যবান, তা হলে তাঁর প্রয়াণে যে শোক, তা অন্য সব মৃত্যু থেকে পৃথক হয়ে যায়। শুনতে নিষ্ঠুর শোনালেও বলতে ইচ্ছা হয় যে, সংবাদ-মাধ্যমে পাওয়া বেশিরভাগ মৃত্যু আমাদের কাছে মৃত্যু পরিসংখ্যানমাত্র হয়ে থাকে, কিন্তু কিছু কিছু মৃত্যু আমাদের প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে এই পরিসংখ্যানের বাইরে এনে দাঁড় করায়।

আগেও অন্যত্র বলেছি এই বিষাদের কথা যে, এই বয়সে মাথার উপর স্নেহের হাত এমনিতেই দুর্লভ, তার উপর যখন সেগুলি একে একে সরে যেতে থাকে তখন নিজেকে আরও অসহায় বোধ হয়। এই সেদিন, ১৪ মে, ২০২০ চলে গেলেন আনিসভাই, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান খান (১৯৩৭-২০২০), যার কাছ থেকে অগ্রজের স্নেহ পেয়েছিলাম। তার পরেই চলে গেলেন ড, মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম (১৯৩৩-২০২০), বাংলাদেশের এক জ্ঞানতাপস, তিনিও আমাকে অগ্রজের স্নেহ দিয়েছিলেন। তেমনই বাংলাদেশে আমার আর-এক অগ্রজ, কামাল লোহানী পরশু চলে গেলেন। আর যেটা সবচেয়ে দুঃখের কথা যে এঁদের মধ্যে আনিসভাই আর কামালদা গেলেন সেই বিশ্বমারি করোনায়—যে রোগ, আমরা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিশ্বাস করে ভেবেছি যে, আমাদের কাছের কাউকে আঘাত করতে পারবে না।

এমন নয় যে, এঁদের মৃত্যু সাংসারিক হিসেবে 'অকালমৃত্যু'। এঁদের সকলেরই বয়স হয়েছিল, নানা রকম সমস্যাতেও এঁরা ভুগছিলেন। কিন্তু বয়সের হিসেবটা অনেকের ক্ষেত্রে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। এক-একজন মানুষ থাকেন যাঁরা শেষ পর্যন্ত কাজ নিয়ে, উদ্যোগ নিয়ে, অংশগ্রহণ নিয়ে, আত্মপ্রকাশ নিয়ে সকলের মধ্যে এত দৃশ্যমান থাকেন যে, যাকে আমরা 'পরিণত' বয়স বলি, সেই গাণিতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বয়সে তাঁদের মৃত্যু হলেও তাকে আমাদের 'অকালমৃত্যু' বলে মনে হয়। বিশেষ করে আনিসভাই আর কামালদার ক্ষেত্রে আমাদের তাই মনে হয়েছে।

২

আমি ইন্টারনেটে বাংলাদেশের কয়েকটা ইংরেজি কাগজে কামালদার মৃত্যুসংবাদ পড়লাম। সব জায়গাতেই দেখেছি তাঁর নামের আগে Journalist কথাটা বসানো হয়েছে। অবশ্যই তিনি এক মহাপরাক্রান্ত সাংবাদিক ছিলেন। কিন্তু ওই একটা শব্দে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা তাঁর গোটা অস্তিত্বের প্রতি এক বিপুল অবিচার বলে মনে হয়।

হ্যাঁ, সাংবাদিক তো তিনি ছিলেনই, কিন্তু সেটা নিছক জীবিকার পরিচয় তাঁর, যাপনের পরিচয় নয়। তিনি মুক্তিযোদ্ধা তো বটেই, কিন্তু মুক্তি যুদ্ধ তো একটা সংক্ষিপ্ত সময়ের ঘটনা। যে সব ছোট ছোট বিদ্রোহ আর যুদ্ধ থেকে পূর্বপাকিস্তানের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল তার সব কয়টিতেই কামাল লোহানী যোগ দিয়েছিলেন। পাবনার এডোয়ার্ড কলেজের ছাত্র থাকার সময়ে নুরুল আমিনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আর দু-বছরের কারাবাস দিয়ে তাঁর যুদ্ধের শুরু। লোকটি এমনিতেই বাঁধাধরা চালে চলতেন না। ছাত্রহিসেবে এমন কিছু খারাপ ছিলেন না, কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পর আর প্রথাগত পড়াশোনা করলেনই না, সাংবাদিকতায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ রকম সাহস কজন লোক করে ? অভিভাবকেরা বলেন, আমরা নিজেরাও নিজেদের বোঝাই যে, অন্তত গ্র্যাজুয়েটটা হওয়া দরকার। কিন্তু পড়া তো ছাড়েননি এক হিসেবে। শেষ বয়সে যখন চোখের দৃষ্টি কমে এসেছে তখন অন্যদের তিনি বলতেন বই

পড়ে শোনাতে, এ অনেকেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে এ দৃশ্য দেখেছে।

তাঁর সাংবাদিক জীবন আর, যাকে বলি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক জীবন, সেই সঙ্গে বলব রাজনৈতিক জীবন যেন পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা হয়ে এক সঙ্গে চলেছে, এবং একটি অন্যটিকে সমর্থন করেছে। সম্ভবত 'মিল্লাত' পত্রে তাঁর সাংবাদিক জীবন শুরু হয়েছিল। তার পর 'দৈনিক আজাদ', 'দৈনিক সংবাদ', 'পূর্বদেশ', 'বাংলার বাণী', 'দৈনিক বার্তা' (রাজশাহি), 'পূর্বদেশ' ইত্যাদি বহু কাগজের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছেন, 'দৈনিক বার্তা'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক থেকে সম্পাদকও হয়েছিলেন। মানুষটি স্বাধীনচেতা ছিলেন বরাবরই, ফলে অনেক সময় পদত্যাগ করেছেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হয়েছে বলে। এই স্বাধীনচিত্ততার একটি গল্প সেদিন বাংলাদেশের এক সাংবাদিকের ফেসবুকের লেখা থেকে দেখলাম। মুজিব হত্যার পর জেনারেল জিয়া বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, তার একটা কোনও সফরে যাওয়ার জন্য তিনি সাংবাদিকদের ডেকেছেন, যারা তাঁর সঙ্গী হবেন। তিনি শর্ত দিলেন যে, সব সাংবাদিককেই স্যুট-বুট পরে যেতে হবে। অনেকেই পড়িমরি করে স্যুট কিনলেন বা বন্ধুর কাছ থেকে ধার করলেন, কিন্তু কামালদা কিছুতেই রাজি হলেন না রাষ্ট্রপতির নির্দেশ মানতে, এবং জেনারেল জিয়া বাধ্য হলেন কামাল লোহানীকে তাঁর চিহ্নিত পোশাক, ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা অনুমোদন করতে। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি প্রেস ইন্সটিটিউটের সভাপতি, ঢাকার সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি—সবই ছিলেন। আর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংবাদ বিভাগের প্রধান ছিলেন, পরে ঢাকা বেতারের পরিচালকও হয়েছিলেন।

তাঁর 'সাংস্কৃতিক' কাজকর্মও বহুধাবিস্তৃত ছিল। তিনি আবৃত্তি করেছেন, ধারাবিবরণী দিয়েছেন রেডিয়োতে, 'নকশি কাঁথার মাঠ' এবং অন্যান্য নৃত্যনাট্যে নেচেছেন, নাটক পরিচালনা করেছেন। উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর সভাপতি ছিলেন দীর্ঘকাল, সেইসঙ্গে নিজে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৯৬৭) ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী। ওয়াহিদুল হক আর সন্‌জিদা খাতুন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের অগ্রগণ্য সংগীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছায়ানটের সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘদিন। পাঠকেরা সম্ভবত জানেন যে, এই ছায়ানট প্রতি বৎসর ঢাকার রমনা ময়দানে বাংলা নববর্ষ উৎসব গানে গানে উদযাপন করে, এবং তাতে মেয়েরা লাল শাড়ি পরে অনুষ্ঠান করে বলে ২০০১ সালে মৌলবাদীরা সেখানে বোমা ছুড়েছিল, একজন তাতে নিহতও হয়েছিলেন। প্রশাসক হিসেবেও তিনি ছিলেন (দুবার) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক।

এ সবের মূলেই ছিল তাঁর নিজের গভীর মানবিক রাজনীতি। বাংলা ভাষার শত্রু নুরুল আমিনের রাজশাহি আসার প্রতিবাদ করে সেই যে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হল ১৯৫৩ সালে, দুবছর জেল খাটলেন তিনি, তার পর থেকে তাঁর মার্কসবাদে থিতু হতে দেখি, এবং ঢাকায় গিয়ে তিনি মৌলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা 'ন্যাপ'-এ যোগ দেন। এবং নির্বাচনি উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে একের পর এক স্বৈরতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন (১৯৫৮), রবীন্দ্র-শতবর্ষিকী পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা আর সমারোহে পালনের পক্ষে আন্দোলন

(১৯৬১), ১৯৬৯-এর গণবিদ্রোহ এবং ১৯৭১-র মুক্তিযুদ্ধে তিনি সমগ্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৫৫ সালেই জেলে থাকার সময়ে শেখ মুজিব, তাজউদ্দীন আহমদ এবং তিনি জেলের একই প্রকোষ্ঠে থাকতেন এবং তখন থেকেই তিনি বঙ্গবন্ধুর বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিলেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে তাঁর ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মুল কমিটিতেও তিনি ছিলেন—তিনি যে থাকবেন সে একরকম অপরিহার্যই ছিল।

৩

ঠিক কবে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ ? তা প্রায় তিরিশ বছরের বেশি হবে। আমার মনে ছিল না, কিন্তু ঢাকায় তিনি একবার আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, দুর্গাপুরে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের বার্ষিক সম্মেলনে তিনি এসেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। সে কথা ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে উচিত হয়নি, কিন্তু তার পরে কলকাতা আর ঢাকায় এত বহুবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে যে, তিনি খুব সহজেই বাংলাদেশে আমার আর-একজন আপন মানুষ হয়ে উঠেছেন। ঢাকায় গিয়েই দেখলাম সবাই তাঁকে ‘দুলাল ভাই’ বলেই ডাকে, এবং আনিসভাইয়ের মতোই তিনি হাজির থাকেন না এমন অনুষ্ঠান ঢাকায় খুব কম হয়। সব সময় ধবধবে সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবি পরা, মাথায় একরাশ শাদা চুল-ওড়ানো এই মানুষটির দীঘল-শ্যামল আর বলিষ্ঠ চেহারার মধ্যে একটা অন্য ধরনের সৌন্দর্য আর আভিজাত্য ছিল। ২০১০ থেকে ২০১২-র মধ্যে ঢাকার বাংলা একাডেমিতে ‘বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ’ সম্পাদনার জন্য যখন বছরে প্রায় দু-মাস করে কাটাতে হত ভাগে ভাগে। তখন বোধ হয় প্রায় প্রত্যেক দিনই তাঁর সঙ্গে দেখা হত। তখনই দেখতাম, আজকাল যাকে ‘আইকন’ বলা হয় বাংলাদেশে তার দুটি প্রধান দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে ঘোরাফেরা করছেন—একজন আনিসুজ্জামান, আর-একজন কামাল লোহানী।

কামালদা যে কত ধরনের কাজকর্মের মধ্যে জড়িয়ে থাকতেন তার একটা নমুনা আমি পেয়েছিলাম। সেটা বোধ হয় ২০১৩ হবে। যথারীতি বাংলাদেশে আছি, মাসটা এপ্রিল, পয়লা বৈশাখ এসে গেল। একেই ঢাকায় পয়লা বৈশাখ একটা হুলুস্থুল ব্যাপার। সকালে রমনার অশথতলায় ছায়ানটের প্রায় আড়াইশো শিল্পীর অনুষ্ঠান শুনেছি ভোর রাতে উঠে, ফিরে এসে শরীর ক্লান্ত। আবাস সেন্টার অব এক্সসেলেন্সে ফিরে বিশ্রাম করবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় কামালদা এসে বললেন, ‘তুমি আছ আজই খবর পেলাম। এখন ওঠো ভাই, চলো আমার সঙ্গে ।‘ আমি বললাম, ‘কোথায় ?’ বললেন, এই কাছেই, শহিদ মিনারে !’ জিজ্ঞেস করলাম, ‘আজ পয়লা বৈশাখ শহিদ মিনারে কী ?’ কামালদা বললেন, ‘সেখানে প্রায় আড়াইশো ছেলেমেয়ের হাতে-খড়ি হবে, তুমি কয়েকটি ছেলেমেয়ের হাতে খড়ি দেওয়াবে !’ যাক, আড়াইশো ছেলেমেয়েকে হাতে-খড়ি দেওয়াতে হলেই তো গেছিলাম।

তো বেরোতে হল তাঁর সঙ্গে। দেখি সত্যি, শহিদ মিনার প্রাঙ্গণ বিচিত্র বর্ণের শিশুতে শিশুতে ছয়লাপ, তাদের মা-বাবা-দাদুরাও এসেছেন সাজগোজ করে, আর কামালদার নেতৃত্বে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই সেখানে উপস্থিত। সে যে কী অসামান্য এক অভিজ্ঞতা। এর আগে আমি দু-চারজনকে হাতে-খড়ি দিইনি তা নয়, কিন্তু সে নেহাতই বাড়ির কুটির-শিল্প বলা চলে। কিন্তু এখানে কোলাহল শুনে মনে হল শিশুর সংখ্যা আড়াইশোর বেশিই হবে কম না। অথচ উদ্যোক্তারা চমৎকার সুশৃঙ্খলভাবে সব কাজটা সাজিয়েছেন। একজন প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা, মানে প্রাক্তন সৈনিকও ছিলেন আমাদের সঙ্গে। কয়েকশো দর্শকের সামনে আমি শিশুদের হাত ধরে অ আ লেখাচ্ছি স্লেটের উপরে, সে আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। তাও আর কোথাও নয়, বাংলাভাষার মহত্তম পীঠ, ঢাকার শহিদ মিনারের প্রাঙ্গণে। মনে আছে, চমৎকার একটি চাদর উপহার পেয়েছিলাম, সেটি এখনও আছে।

কলকাতায় বহুবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমি যে সংঠনের সঙ্গে যুক্ত, সেই গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের ডাক পেলেই তিনি সাড়া দিতে দ্বিধা করতেন না। প্রয়াত সম্পাদক স্নেহাস্পদ ইন্দ্রনাথ তাঁকে আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। বহুবার পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং অন্যত্র তাঁর সঙ্গে একই মঞ্চে উপস্থিত থাকার গৌরব পেয়েছি। এই গত বছরও সোনারপুরে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী একটি সভায় তাঁকে পেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গ সবসময় আনন্দময় ছিল। ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমিতে, উদীচীর অনুষ্ঠানে—বহুবার তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছি, পারিবারিক সম্মেলনেও তাঁকে পেয়েছি। উদীচীর ষাট বছরের জয়ন্তীতে গণতান্ত্রিকের প্রতিনিধিরাও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তবু এ সবের বাইরে, কামালদার চলে যাওয়া অনেকের মতো আমারও এক গভীর ব্যক্তিগত শোকের ঘটনা। উপর থেকে আসা আমার আর-একটি স্নেহের উৎস রুদ্ধ হয়ে গেল।

আনিসভাই এবং কামালদার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তবুদ্ধি আর অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির দুজন বড় অধিনেতার বিলোপ ঘটল। এই গোষ্ঠী বাংলাদেশে যথেষ্ট বড়, কিন্তু তাঁরা যে নানা কারণে মৌলবাদের নতুন শক্তিলাভে বিপুল চাপের মধ্যে আছেন তাও জানি। এই সময়ে যাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পতাকা-বহনকারী এবং প্রগতিশীল মানবতাবাদী আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিতে পারতেন তাঁদের দুজন অপসারিত হলেন।

কামালদা'র বিরাশি বছরের জন্মদিনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, শরীর ভেঙ্গে এসেছে, দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ, জীবনের কাছে তিনি আর কি আশা করেন? তিনি বলেছিলেন, যেটুকু ক্ষমতা থাকবে তা দিয়ে শেষপর্যন্ত আমি মানুষের কাজ করে যেতে চাই। একজন খাঁটি মার্কসবাদীকে মানুষের কাছের মানুষকে বাধ্য করা হল তাঁর সারাজীবনের কাজ থেকে ছুটি নিতে।

প্রবন্ধ

পূর্ণ চাঁদের মায়া

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

যিনি ইতিহাসবেত্তা নন, রাষ্ট্রসমাজনীতিজ্ঞানের অর্বাচীনতায় প্রখর, শিল্পকলাজ্ঞানে charcoal-নিন্দিত --- তিনি যদি এক বিকেলে এই তিন বিষয়ে আপনাকে বেমক্কা উপদেশ দেবার তোড়জোড় নেন.... আমি মোটেই আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করবো না -- হাল ক্যায়সা হ্যায় জনাব কা ?

হাল খারাপ হতে বাধ্য -- আমার সেটুকু আত্মবিশ্বাস আছে।

ঠিকই ধরেছেন স্যার... জ্ঞান আমিই দেব এবং দিতে শুরু করে দিয়েছি ধরে নিন।

★

ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ আমরা যখন দুহাতে সরিয়ে ক্লান্ত , তেমনই এক নিশিতে নৈঋত কোণে বুঝি উঁকি দিল ভুবনমোহন এক ফালি বাঁকা চাঁদ!

কে দেখেছে? কে দেখেছে? -- কানু দেখেছে ।

কানু আবার জাতি-ধরম নির্বিশেষে দেখিয়েছে আরজন কে -- চাঁদের আলো লুটে নে রে তোরা!

দেখেছেন তো দারুন অর্থবহ সেই বিকানির পর্যায়ের মিনিয়েচার পেন্টিং টি ? গত দু তিন বছর রামাদানের শেষে চাঁদ-পার্বণের সৌভ্রাত্রের representative image হিসেবে আনুমানিক ১৭৫০ সালে আঁকা এই ছবিটি বহুল প্রচার লাভ করেছে।

নি:সন্দেহে শুভ উদ্যোগ।

শুধু দেখবেন? আসুন,

রং-তুলির সাথে তুলোট কাগজের খোঁজে নেমে পড়ি বরং।

✶

মুঘল শাসকবংশ কিন্তু সব অর্থেই শাহেনশা ছিল। তার খুব শীঘ্রই বুঝেছিল যে ইতিহাসে সাম্মানিক হতে হলে ভূগোল আর অর্থনীতি কম্বিনেশন-ই যথেষ্ট নয় -- শিল্প সাহিত্য কে উপক্রমণিকায় রাখতেই হবে... আর দেশজ পৌরাণিক সাহিত্য আর চিত্রকলার সাথে পথ না চললে -- বৈরিতাবিহীন সীমান্তবিস্তার সম্ভব নয়।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধের সময়কাল কে Watershed line of Indo- Persian (আরো ব্যাপক অর্থে Indo- Islamic) Art and Architecture বলা হয়েছে।

একমাত্র আওরেংজেবের শাসনকাল (সন ১৬৫৮ থেকে ১৭০৭) ছাড়া, মুঘল শাসকরা সকলেই বৈদিক শিল্পকলা (Vedic Art) এবং শ্রীকৃষ্ণ

লীলা-সঞ্জাত ভক্তিভাব-ধারা (Bhakti School) বর্ণনে বাধা তো দেনই নি, বরং পারস্য, তুরস্ক এমন কি আরব দেশ থেকেও গুণী শিল্পী-কারিগর - বাস্তুকার নিয়ে এসেছিলেন --- নতুন আঙ্গিকে সেগুলিকে বঞ্জ্যনাময় করে তুলতে।

সেই সব মুসলমান (‘ যবন ’) শিল্পীদেরও বলিহারি ! শ্রীহরি কে এতো যত্নে-লালিত্যে--সুষমায় তাঁরা কয়েক শতক ... কয়েক প্রজন্ম ধরে শিলাপটে - প্রাচীর গাত্রে -- তাল তমাল...নাম না জানা কত গাছের পাতার ক্যানভাসে -- তুলোট কাগজে ফুটিয়ে রেখে গেছেন অনন্তকালের জন্য!

এদের কথা একটু শুনবেন না?

★

সম্রাট হুমায়ুন পারস্য থেকে সমাদরে নিয়ে এসেছিলেন দুজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পীকে।

মীর সঈদ আর আব্দুস সামাদ।

এঁরা ভারতের অমেয় প্রেক্ষাপটে নিজেদের অধীত শিল্পকলাকে নতুন করে খুঁজে পেলেন এবং

'হিন্দোস্তান' এর প্রেমে পড়লেন।

হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কতো শিল্পী যে তাদের জলচৌকির নীচে বসে শুনলেন পারস্যের কথা... আঁকলেন ছবি। ওনারাও হিন্দু পন্ডিতদের কাছে শুনলেন মহাভারত -রামায়ণ - হরিবংশ

পুরাণের নানা কল্পকথা।

বিশেষ করে হরিবংশ পুরাণ (যেখানে মহর্ষি বেদব্যাস, ১৬৩৭৪ টি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণর বাল্য-কৈশোর লীলা ব্যাখ্যান করেছেন... যেখানে মা যশোদা, পিতা নন্দরাজা, ভাই বলভদ্র, সাথীসঙ্গী, প্রজা আর অবারিত প্রকৃতির হাত ধরে তার বেড়ে ওঠা) তাদের বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল।

এভাবেই শুরু হয়েছিল এক নতুন নান্দনিক শিল্প ধারা -- The Mughal School.

এই ধারায় যেন ছিল পারস্য আর দেশজ কলার এক মিশ্র (fusion) প্রকাশ।

হরিবংশ চিত্রমালার সেই ছবিটির কথাই ধরুন না, যেখানে বালক কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করে ব্রজবাসীদের ইন্দ্রের রোষানল থেকে রক্ষা করছেন।

এখানে আপনি মনোযোগ না দিয়ে দেখলেও খুঁজে পাবেন " Hallmark features similar in style to the many illustrations in Babur-nama, the biography of Babur. "

আর যদি একটু স্থিতধী হয়ে ছবিটি দেখেন -- খুঁজে পাবেন এক চমৎকার সহাবস্থানের চিত্ররূপ।

যশোদানন্দনের স্বজন-স্বগণের মধ্যে রয়েছেন স্পষ্টত ভিন্নধর্মী (পড়ুন মুসলিম) মানুষজন।

মীর সঈদ আর আব্দুস সামাদ তৎকালীন "হিন্দোস্তানে"র সৌভ্রাত্র যা দেখেছিলেন -- তাই তুলিরঙে ফুটিয়েছিলেন।

অতিরঞ্জন বা অনৃতভাষণ কোনটাই নয়।

উল্লেখ্য, এই মুঘল স্কুল অফ আর্ট - পর্যায়ের ছবি গুলি প্রায় সবই রয়েছে ভারতের বাইরে।

ফিলাডেলফিয়ার মিউজিয়াম অফ আর্টের আর্কাইভ-এ আছে সবচেয়ে বেশি।

আকবর বাদশা (শাসনকাল ১৫৫৬ - ১৬০৫) তুরস্ক থেকে নিয়ে আসেন

মিস্ কিন নামের এক শিল্পীকে।

বলা হয় তিনি ১৫৯৫ সালে গিরি গোবর্ধন পর্যায়ের ফ্রেস্কো ছবিটি শেষ করেন। বড় পটভূমিকায় বালক কৃষ্ণর সাথে মুসলিম

প্রজাদের বন্ধুতার চিত্রখানি আরও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

এই মিঁয়া মিস্ কিন গাছ-ফুল -ফল-প্রকৃতির "ফিউশন " করেছেন আহরহ।

" বলরামের অসুর ধেনুকা বধ" ছবিটির কথাই ধরুন না!

তাল-তমালের পাশেই এঁকেছেন এ্যাপরিকট গাছ , গুলঞ্চের পাশেই ফুটিয়েছেন বেদানার কুঁড়ি।

আকবরের শাসনকালের পরেও পাওয়া যায় আরও কয়েকজন শিল্পীর নাম, যাঁদের ছাড়া মুঘল ধারার চিত্রকর্মের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রয়েজ যায়।

নূর মহম্মদ বড় যত্নে এঁকে গেছেন ক্ষীর সাগর মন্থন পর্ব আর ওয়াজিদ খান (ভারতে ছিলেন বহুদিন : ১৬৮০ থেকে ১৭৩০ সাল পর্যন্ত) কৃত কুসুমদোলায় শ্যাম -রাই তো আজও ছবির

নিলামে (প্রিন্টই সই!) লাখটাকিয়ার সওদা, মশাই।

★

মধ্যভারতের মালওয়া-র অঞ্চলিক চিত্রকলায়ও মুঘল আমলে পড়েছিল মিশ্রণের প্রভাব। ১৬৩৪ সালের কিছু পান্ডুলিপিতে-- কেশবদাস বিরচিত "রসিকপ্রিয়া " -- দেখা যায় পারস্যের স্টাইলে আঁকা কানুপ্রিয়া। একেবারে সুগোল পানপাতা মুখশ্রী... চিবুকের ঢৌল!

রাজস্থানের বিকানির, যোধপুর, মেওয়ার ছিল এই " শিল্প আন্দোলনের " বড় শরিক।

জয়দেবের ' গীতগোবিন্দ ', কেশবদাসের ' রসিকপ্রিয়া কাব্য', ' ভাগবত পুরাণ ' -- সবকিছুই যেন নতুন করে ছোপান হল মুঘল নব্য কলা রীতিতে।

বড় কথা, মুঘল সাম্রাজ্য অবসিত হওয়ার পরেও (সন ১৭৫০ পরবর্তী) এই ধারা প্রবাহিত হয়েছিল রাজস্থানে। প্রধানত সেই নিদর্শনই রক্ষিত হয়েছে বিদেশের লেখ্যাগারে।

রাজস্থান পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান চিত্রশিল্পী ছিলেন মহম্মদ হামিদ রুকনুদ্দিন।

নন্দলালার কতো ছবি যে তিনি এঁকে গেছেন -- নিজের দু খানি হাত ও বোধহয় জানতো না।

তিনি আবার গুরু মানতেন এক ভবঘুরে সুফি কবি-শিল্পী আলি রেজা কে।

কোথা থেকে এসেছেন... কোথায় গন্তব্য -- কিছু জানা নেই। আকবর নাকি রত্নসভায় আসন পেতে দিয়েছিলেন। রাহিগর শিল্পী ততক্ষণে ছেঁড়া রুমাল খানি মেহগিনি গাছের নীচে বিছিয়ে ছবি আঁকা শেখাচ্ছেন একপাল দামাল-দস্যিকে !

আলি রেজার শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিল হামিদ রুকনুদ্দিন। বর্ণ আর অবয়ব যেন তার ছবিতে প্রাণ পেয়ে খেলে বেড়াত।

শিশু কৃষ্ণ আর তার পালক পিতা নন্দরাজা কে একসাথে দেখা যায় তাঁর ছবিগুলিতেই।

আচ্ছা, কেমন দেখতে ছিলেন নন্দ মহারাজ?

আচার্য প্রভুপাদ ভক্তিবেদান্ত লিখেছেন :

"Krsna's father is Nanda Maharaja. Nanda

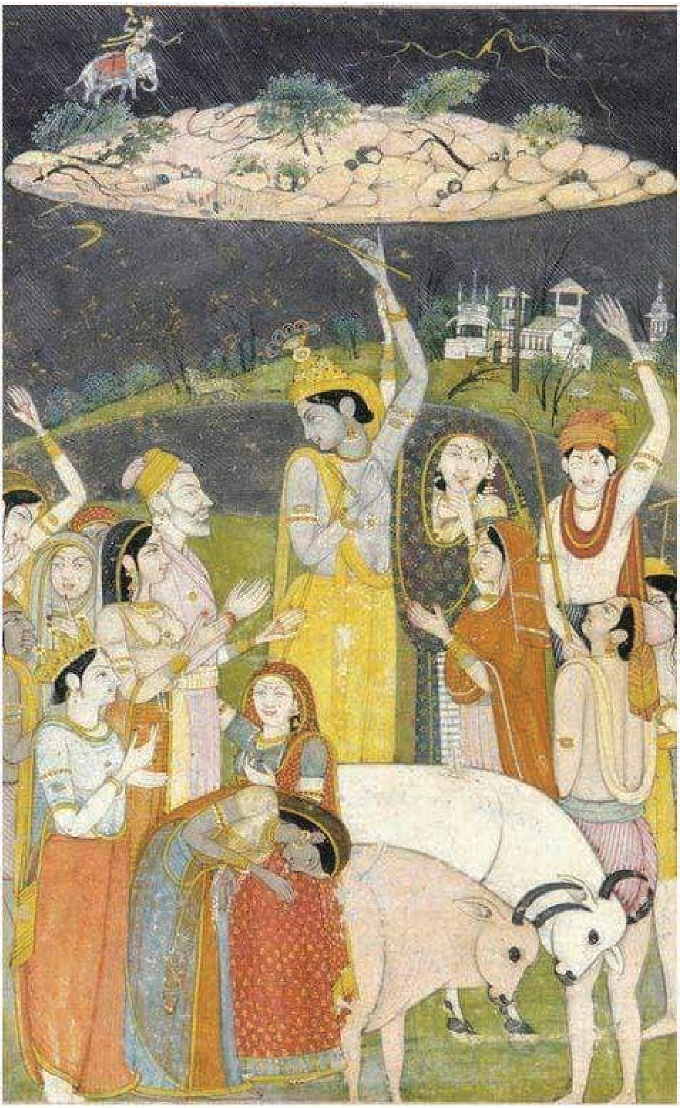

delights the residents of Vraja and he is worshiped by all the worlds.

He has a protuberant belly, his complexion is the colour of sandalwood, he is tall in stature and his garments are the colour of a bandhujiva flower.

His beard is a mixture of black and white hairs, like rice and toasted sesame seeds mixed together. “

ও হরি ! বুঝুন কান্ড !

আলী রেজা ও তস্য ছাত্র রুকনুদ্দিন তো তাই এঁকেছেন জীবনভর। নন্দলালা আর বলভদ্রর পাশে পাশে যে পাগড়ি পরা -- সাদা দাড়িওয়ালা

‘ মুসলিমোচিত ‘ বয়স্ক মানুষটির আইডেন্টিটি বহু যুগ ধরে কলা সমালোচকরা খুঁজে বেড়ালেন -- তিনি পরম স্নেহময় নন্দবাবা !

AntiClimax এরও Antibody হয়, জনাব !

★

সেই ছবিটিতেই ফিরে আসি।

চলুন, মন দিয়ে দেখি।

বালক কিষুন মহারাজ আছেন, বলরাম আছেন, নন্দ রাজা আছেন --- আর আছে ধর্ম নির্বিশেষে কিছু মানুষ-নারী। অবশ্যই মুসলিম প্রজারা আছেন।

দূর আকাশে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন কৃষ্ণ...ভাই বলরাম ও কম যান না -- সেও উত্তেজিত !

হয়তো, চাঁদ দেখছেন সকলে...

চাঁদ পরবের একফালি বাঁকা চাঁদ না ষোলকলায় পূর্ণ পূর্ণিমার -- সম্পূর্ণ ছবিটিকে না দেখে বলতে পারা যাবে না।

মজার কথা আর একটু বাকি আছে এরপরও ।

Philadelphia Museum of Art এ রাখা আছে ছবিটির একটি অসম্পূর্ণ Version.

নন্দরাজা, কৃষ্ণ আর বলরাম। দৃষ্টি নিবদ্ধ আকাশে।

ছবিটির নাম : “Krishna and Balarama showing the Moon to Nand Maharaja. “

একই ছবির (বোধহয়) সম্পূর্ণ ভার্সন টি রাখা আছে কানাডার McGill University র Institute of Islamic Studies এর আর্কাইভে।

“Krishna Points Out the Eid Moon. “

জনাব হামিদ রুকনুদ্দিন যে এই দুটি ছবিরই শিল্পী -- এ বিষয়ে কিন্তু দ্বিমত নেই ।

★

তাহলে কি দাঁড়ালো মশাই ?

কিছু দারুন ছবির সুলুক সন্ধান পাওয়া গেলো, দেখাও গেলো একগণ্ডা , আর যেটা বোঝা গেল -- সেটা শত শত বছর ধরেই বোঝা যাচ্ছে.... বুঝতে যে হবেই !

নিয়ে আসুন ডিবে... যুযুধান দুজনার হাতেই ঢেলে দিন... দেখুন নিজেরাই বলবে তারা --

ভেরি ভেরি সরি.... মশলা খাবি ?

✶

চিত্রকথা :

1) McGill University Inst. of Islamic Studies এ রক্ষিত ছবিটি

2) Philadelphia Museum of Arts এ রক্ষিত ছবিটি

3) নন্দ মহারাজ, যশোদা, বলরাম আর কৃষ্ণ

--গোপ পরিবার, সুখী পরিবার

4) গিরি গোবর্ধন উত্তোলন

✶

তথ্যসূত্র :

Muslim Devotees of Krsn : Prof. D.K.Deb (2014)

Philadelphia Museum of Arts Catalogue (vol - 4)(2010)

দেশে দেশে মোর ঘর

যশোধরা রায়চৌধুরী

I have always imagined that Paradise will be a kind of library.

৬

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি
“পথে এবার নামো সাথি পথে হবে পথ চেনা”

১

তুমি ট্রেইলে যাবে?

ট্রেইলে? মানে, মানে?

না, মানে আমাদের এখানে কাছেই একটা ট্রেইল আছে ত, হিউরন নদীর ধার দিয়ে দিয়ে। যাবে?

এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। ভাই, ইয়ার্কি না। নদীর ধারে বিকেলে ঘুরতে গেলাম দেবু ও তনিমার সঙ্গে। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও তনিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ওরা থাকে মিশিগানে। তনিমা মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে। কাছেই ডেট্রয়েট, যেখানে গাড়ি শিল্পের ধ্বংসাবশেষ এখন, জ্যান্ত গাড়ি কোম্পানিদের বিশাল বহুতলের পাশাপাশিই।

তবে ওরা ত থাকে গ্রামে। অ্যান আরবরে। বিলাসবহুল, মধ্যবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্তের বাড়িঘর যাকিছু সুখের, আরামের, তা সব বড় শহরের "ডাউনটাউন" থেকে অনেক দূরে। গাড়ি চালিয়ে কিলোমিটার ছয় সাতেক গেলে তবে কাজের জায়গায় পৌঁছনো যায়। অন্যথা পাখির ডাক, কাঠবেড়ালির খুটুর খাটুর এসব নিয়ে, পর্চে এসে পড়া লালচে মেপল পাতার হেমন্ত, সাদা তুষারপাতের শীতকাল নিয়ে ওরা থাকে।

আর, ছুটিছাটা পেলেই ট্রেইলে যায়। ভালবাসে ট্রেইল। নিকটবর্তী বলতে ঐ হিউরন নদীর ধার। একেবারেই ঘন গাছপালা জঙ্গল এখানে। কাঠের ছোট ছোট সেতু, বিশেষ যত্নে রাখা কাঁচা পাকা রাস্তা, দুধারে স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক গাছপালা রাখার চেষ্টা হয়েছে। এই হল গে ট্রেইল। ছোটদের খেলার জন্য একটা ছড়ানো গড়ানো বেড়াহীন পার্ক, বেঞ্চি মাঝে মাঝে। হাঁস চরছে, পাখি উড়ছে। লাল বুকের রবিন, অথবা লাল ডানার জ্যে পাখি।

হাঁটার পথে কোন বেঞ্চি উতসর্গীকৃত কারোর মৃত ছেলে বা মেয়ের নামে। পাথরের ওপর লোহার ফলকে তার নাম। কারোর বা নামের সংগে দু কলি কবিতা। মিশিগানের শান্ত শীতল জঙ্গল, অতি যত্নে রক্ষিত। প্রাণে ঠান্ডা আঙুল বুলিয়ে দেয় তা। উইকেন্ডে বাবা মা যায় বাচ্চাদের নিয়ে, ঝুড়িতে আপেল ও স্যান্ড উইচ প্যাক করে নিয়ে, সারাদিনের পিকনিকে, এইসব ট্রেইলে।

আরিজোনার ফিনিক্সে মিশিগানের মত শীতল আবহাওয়া নয়, মার্চ মাসে। সে সময়টা রোদ্দুরে স্নাত, হাওয়া শীতল হলেও, চড়া রোদে বেরুলে গ্রীষ্ম বলেই মনে হয়।

ট্রেল টা গোটাটাই পাহাড়ে। আপিসে পর সবাই গাড়ি রাখছে আর হয় গাড়ির মাথা থেকে সাইকেলটা পেড়ে নিয়ে বাইকিং করছে, নয়, হাঁটাহাঁটি। পোষা কুকুর সঙ্গে আছে কারুর। কারুর আছে ছেলে বা মেয়ে। পাহাড়ে চড়ো। দেখ চারিপাশে অসংখ্য হাত তোলা মানুষের মত, কিন্তু মানুষের তিন গুণ আকার সাউয়ারো (বানান অনুযায়ী পড়লে সাগুয়ারো) ক্যাকটাস বৃক্ষ। ছোট ছোট বদমাইশ বাচ্চার মত বা গুঁড়ি মারা খোক্কসের মত ক্যাকটাসের ঝোপ, অসংখ্য বুনো ঝাড়, হলুদ সাদা ফুল ফুটে ওঠা নানা ধরণের ঝোপ আসেপাশে আলো করে আছে। পাথরের চট্টানে পড়ে বিকেলের সোনালি রোদ্দুর ঝলকে উঠছে। শুষ্ক ঠান্ডা চমৎকার বাতাস বসন্তের। আর কদিন পরে ভয়ানক গরম পড়বে, উষ্ণতায় ফুটি ফাটবে। জল, জল করে

অস্থির হবে তুমি। তবু সন্ধে সাতটা, সাড়ে সাতটা, আটটা, নটা অব্দি সূর্য থাকবে এই উত্তর গোলার্ধে। অফিসের পর এসে যতখুশি শরীর চর্চা কর, পকেটে জলের বোতল রেখে অবশ্যই।

স্যান এঞ্জেলোর ট্রেল আবার ঈষত উচ্চাবচ, কিন্তু পাক দিয়ে আছে লেক কে। এই হ্রদ শহরের মধ্যে একমাত্র জলা জায়গা। পরিচ্ছন্ন জল। চিকচিক করছে। পাশ দিয়ে দীর্ঘ সাপের মত পাকিয়ে আছে পাকা রাস্তা। লেকের ধারে ধারে প্রাইম প্রপার্টি অনেক আছে। সেসব বাড়ির লোকেরা এ রাস্তায় গাড়ি চালালেও, দিকে দিকে নোটিস দিয়ে বলা আছে, এখানে রাইট অফ ওয়ে দিতে হবে জগার বা হাঁটিয়েদের। প্রত্যহ সন্ধ্যায় এই ট্রেলের মুখেও বড় পার্কিং এ গাড়ির সারি। মানুষ স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে ঢুকে পড়ছে সে পথে।

ফিনিক্স, স্যান এঞ্জেলো এবং অ্যান আরবরের পর, বস্টনে গিয়ে যেই না আমাদের গৃহকর্তা ট্রেইলে যাবার উল্লেখ করেছেন, সঙ্গে

সঙ্গে না না, আমাদের ট্রেইল দেখা হয়ে গেছে বলে চেপে গেলাম। এখনো বরফ গলছে গত সপ্তাহের বরফ ঝড়ের, দিকে দিকে ভেঙ্গে পড়ে আছে গাছ। এই কর্তার বাড়িতে দুটি ক্যানো রাখা। নদীতে রেগুলার যান গ্রীষ্মকালে ক্যানুইং করতে। আপাতত ট্রেইলে গিয়ে এক ঘন্টা হেঁটে জমে টমে যেতে পারি। ভেবে শঙ্কিত আমি।

২

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি - এই সব কবিতা আমাদের আছে বৈকি, তবে রবিবাবু কীভাবে গিয়েছিলেন জানা নেই। ২০১০ এর নির্মীয়মান ফোর লেন রাস্তায় গৌহাটি থেকে শিলং যাওয়ার দুঃসহ যাতনা বোধ হয় তখন রবি ঠাকুর দেখেন নি। ইদানীঙ উড়িষ্যায় দারুণ হাই ওয়ের সফর করি, পঃবঃ খুব পেছিয়ে ছিল, একটু ভালর দিকে এখন হাইওয়ের অবস্থা। যেটা আমাদের নেই সেটা হাই ওয়ের কালচার। ধাবায় ধর্ষণ হয়, মদের ঠেক তুলতে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট করতে হয়। বাথরুম নেই বলে জল খাওয়া বন্ধ রাখতে হয় ঘন্টার পর ঘন্টা।

গোটা একটা বিশাল উপমহাদেশের প্রতি রাজ্যে সমস্তরের ফেসিলিটিতে কেয়াবাত কেয়াবাত বলতে ইচ্ছে হল আবার। আমেরিকার সুবিশাল তিন তিনটে দক্ষিণ প্রদেশের মধ্যে দিয়ে গাড়িতে ঘোরার অভিজ্ঞতায় এই জিনিসটাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ার।

আমরা শুরু করলাম টেক্সাস থেকে, এবং যাবার পথে থেমে থেমে নিউ মেক্সিকোর সান্টা ফে তে দু রাত কাটিয়ে, ঐতিহাসিক রুট সিক্সটি সিক্স হয়ে, গ্রান্ড কানিয়ন দেখে, আরিজোনার ফিনিক্সে পৌঁছে থামলাম। এ পথ ১০৫৪ মাইল মত। ফেরার পথে আবার ফিনিক্স থেকে টানা পনেরো ঘন্টা চলে টেক্সাসে স্যান এঞ্জেলো। প্রতি দু তিন ঘন্টা অন্তর গ্যাস স্টেশনে থামা, মাঝারি থেকে খুব পরিষ্কার রেস্ট রুমে জলবিয়োগ, কয়েক গ্যালন গ্যাস ভরানো গাড়ির ট্যাঙ্কিতে, সুপারমার্কেটের মিনি ভার্শান গ্যাস স্টেশনের সুখাদ্য ও কোকাকোলা দিয়ে জলযোগ.. দু তিন ঘন্টার বিরতিতে গাড়িতেই হাতে হাতে খেয়ে ফেলা সঙ্গে নেওয়া নানা মুখরোচক খাদ্য... এইরকম চলল। ক্রমশ অভ্যেস হয়ে আসে গতি। যারা চালাল, দিদি

আর জামাইবাবু, জানিনা চাপ নিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে বলেই কিনা, তারাও ত সানন্দেই এ কাজ করল, যদিও অল্প ভাগাভাগি করে। দায়িত্বহীন ক্ষমতা নয়, বেশ কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হয়। রাজ্য থেকে রাজ্যে বদলে যাওয়া স্পিড লিমিটের নিরিখে গাড়ির স্পিড ঠিক রাখা, ম্যাপ দেখা, ড্রাইভারের পাশের সঙ্গী হয়ে বসে ঘুমিয়ে না পরা, চোখ কান খোলা রাখা তৎপরতা, এসব ত জরুরি বিষয় নিশ্চয়ি। আমি ও আমার মেয়ে শুধু ব্যাক সিটের প্যাসেঞ্জার। উপভোগটুকুই আমাদের সঞ্চয়ে রয়ে গেল।

হাইওয়ে বিষয়টাই, ওই আর কি, স্টেট লাইব্রেরির মতই, আমেরিকার আর একটা জিনিস যা আমাকে টানে।

সত্যি আমেরিকায় যদি চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া কিছু থেকে থাকে তো তা এই অসংখ্য সুন্দর সুন্দর রাস্তা দিয়ে গোটা আমেরিকাটাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলাটাই। উন্নতি। প্রগতি। বিজ্ঞান। নানা শব্দে এই প্রথম বিশ্বের দেশটার কীর্তিকলাপ ত বর্ণনা করা হয়। সবকিছুর মূর্ত প্রতীক যেন এই লম্বা লম্বা হাইওয়েগুলো। এত ঝকঝকে ইস্পাতের ফলার মত তাদের চেহারা, তাদের গঠনে নানা দেশ থেকে আসা ইঞ্জিনিয়ারদের অবিরত মাথা ঘামানোর প্রমাণ।বড় বড় ইন্টারস্টেট হাইওয়ে একটার পর একটা তৈরি হয়েছে ১৯০০ র আশপাশ থেকে শুরু করে।

এই লম্বা সোজা সোজা রাস্তাগুলো ধরে অনেকদূর চলে যাওয়া, লং ড্রাইভ। এর একটা নেশা আছে। আর আছে পেঁচানো, গোল করে বানানো একজিটগুলো, যেগুলো যে কোন জনপদের কাছাকাছি

আছে, প্রয়োজনে হাইওয়ে ছেড়ে জনপদের দিকে যাবার জন্য। আকাশ থেকে পাখির চোখে দেখলে ফুলের মত দেখতে যেন, ফিতে দিয়ে বানানো বিনুনির ফুল।

ব্যস্ত জনপদের পাশ দিয়ে যখন চলে যায় সেই ইন্টারস্টেট, তখন তার জন্য বেশ কিছু একজিট লাগে। হাইওয়ের দ্রুতগামী গাড়ির সারি কোনভাবে ব্যাহত হবে না, বাঁ পাশে ডানপাশে বেরিয়ে যাবে ফ্যাকড়া রাস্তা, যা দিয়ে শহরের গাড়ি ঢুকবে হাইওয়েতে, কিন্তু দ্রুতগতির গাড়িদের স্লো ডাউন করতে হবে না, আবার কোন শহরে যেতে গেলে বেরিয়েও যেতে হবে ফ্যাকড়া দিয়েই কারো অসুবিধা না ঘটিয়ে। অনেক সাইনবোর্ড লাগানো থাকে হাইওয়েতে। প্রতিটা জাংশনের আগে বুঝিয়ে দেওয়া থাকে কোনদিকে যেতে গেলে গাড়িকে তুমি কোন লেনে নেবে। একেবারে মাঝে লেনগুলি থ্রু যাচ্ছে। এপার ওপার হয়ে যাচ্ছে সব জাংশন অতি দ্রুত।

এবার আসি পথের পাশের দৃশ্যগুলোর কথায়। টেক্সাস থেকে নিউ মেক্সিকোর রূপ, নীল চকচকে আকাশ আর হলুদ গমের বা ভুট্টার ক্ষেতের সীমাহীন বিস্তার। ভ্যান গহ-এর আঁকা ছবিও মনে পড়তেই পারে। তবে বেশি গা ছমছম করছিল হিচককের ছবি নর্থ বাই নর্থ ওয়েস্টের সেই শুনশান রাস্তা আর গমের ক্ষেতের সিকোয়েন্সের কথা মনে পড়ে। ছোট প্লেন নিয়ে কেরি গ্রান্ট কে তাড়া করার দৃশ্যটা ভেবে।

সে দৃশ্য নাকি ক্যালিফোর্নিয়ায় শুট করা হয়েছিল।

পড়ন্ত সূর্যের আলোয় হলুদ মাঠ সোনালি। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, অলক মেঘের অবাস্তব দৃশ্য।

আবার নিউ মেক্সিকো থেকে যখন আরিজোনার দিকে যাওয়া, নানা ধরনের আকৃতির বহু প্রাচীন পাহাড়এর ফর্মেশন দেখতে দেখতে পথ চলা। আপাশে থেকে শুরু করে নানা ধরণের ইন্ডিয়ান আদিবাসীদের বাসভূমি অসংখ্য ছোটবড় পাহাড়ে সাজানো এই পথ।

আর রাত্রি হয়ে এলে, আকাশে অগণিত তারার ঝকমকিয়ে থাকা, স্পষ্ট দেখতে পাওয়া কালপুরুষের কোমরবন্ধ কালপুরুষের সঙ্গের কুকুরটি।

পৃথিবীর সব দেশ, মানুষ, পথ... কালপুরুষের কাছে সমান।

৩

রেশম পথের কথা ত আগেই বলেছিলাম, যখন উজবেকিস্তানে আমির তিমুর অর্থাৎ দুর্দম তৈমুর লং-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। পুব আর পশ্চিমের মধ্যে একটা সুতোর মত পথ। একদিকে চিন, চিনের অসামান্য সব রেশমের কাপড়, যাকে ভারতীয়রা চিনাংশুক বলে ডাকে। অন্যদিকে আরব দুনিয়া, তুর্কিস্তান। আজ ইউরোপ বলে লোকে যাকে জানে সেই পর্যন্ত পথ চলে গেছে পশ্চিমে। সুগন্ধি আতর আর মশলা আর মধু আর হাজারো সামগ্রীর কেনাবেচা চলে। ভারতীয় বণিকেরা তাদের মহার্ঘ পাথর গয়না সোনা দানা আর কাপড় নিয়েও আসছে যাচ্ছে এই পথেই। এই পথ গোটা এশিয়াকে বেঁধে ফেলেছে যেন পুব পশ্চিম বরাবর।

ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়। মরুভূমির ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে যাযাবরের মত, ব্যবসায়ীদের ক্যারাভান। উটের সারি, সমরখন্দের বিখ্যাত তেজি ঘোড়াদের দল, আর একটু ধীরগতি গাধা খচ্চরের সারি। তাদের পিঠে পশরা নিয়ে সেই কোন দূর ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে, নানা দেশের ব্যবসায়ী চলেছে। গায়ে তাদের আলখাল্লা। তুর্কি থেকে চিনের দিকে চলেছে একদল ব্যাপারি, চামড়া, খুব দামি আতর, পশম রুপো আর অম্বর-সুগন্ধী নিয়ে। আরব ব্যাপারিদের শরীরে খুব বল, খেজুর খেয়ে খেয়ে চামড়া উজ্জ্বল বাদামি। গায়ে অসম্ভব জোর। ভারতীয়রা আসে, সুতির সূক্ষ্ম কাপড় আর তামা সোনা আর রুপোর মত মহার্ঘ ধাতুর তৈরি জিনিশ নিয়ে। তাদের গায়ের রঙ বাদামি, চোখ মুখ সুন্দর। আর চিন থেকে ব্যাপারিরা আসে রাশি রাশি রেশম নিয়ে, চা চিনি নুন মশলা নিয়েও। আরো ছোট আর সুন্দর আর দামি জিনিসও থাকে তাদের কাছে। মূল্যবান মণিমুক্তো, কস্তুরী আর বাঘের হাড়। পাখির পালকে সাজানো টুপি। আর সাদার ভেতর নীলের কাজ করা, নানা রঙ দিয়ে আঁকা চিনেমাটির অপূর্ব বাসনপত্র নিয়ে আসছে টানা টানা চোখের, গোল মসৃণ মুখের হলুদ চামড়ার অনেক ব্যবসায়ী।

একদিকে সমরখন্দ, অন্যদিকে বাবরের জন্মভিটে বুখারা। আর এইদিকে তাশকেন্ত। সমরখন্দে আমির তিমুর, যাকে ইতিহাস জানে তৈমুর লংগ বলে, সেই তৈমুর লংগ বানিয়েছিল অনেক অনেক সুন্দর মসজিদ আর এবাদত খানা। নীল পাথরের কারুকাজ করা সেইসব এবাদতখানা আর প্রার্থনার স্থলগুলোর প্রতিটায় যে

ঝকঝকে ফিরোজা রঙ আর গাঢ় নীল রঙের মিশেল আছে, ছোট্ট ছোট্ট পাথরের যে সব অদ্ভুত জ্যামিতিক কাজ আছে, সেগুলো সব বানানো হয়েছিল ইরানি তুরানি ইস্পাহানি কারিগরদের দিয়ে। ইরান ইরাক সব জায়গায় ঐ কাজ আছে। সূক্ষ্ম কাজ যেন কাগজ ভাঁজ করে সাজানো, আসলে পাথরের কিংখাব সব। বহু বছরের জন্য রেখে দেওয়া।

সমরকন্দের হলুদ বালিতে এই যে অদ্ভুত নীল নীল জলাশয়ের মত মসজিদ, মাদ্রাসা আর এবাদতখানা জেগে আছে, এ জায়গাটাকে বলে তৈমুর লঙ্গের স্বপ্ন।

স্বপ্নই তো বটে। মরিচীকাও বটে। হলুদ মরুভূমির বালি তেতে গিয়ে বাতাস হালকা হয়ে গেলে চোখের সামনে ভোজবাজির মত নড়ে চড়ে ওঠে, কেঁপে ওঠে যে সব আকার, ভূতুড়ে সব ছায়া, মনে হয় দূরে জল চিকচিক করছে, ঘোড়ায় চেপে দিকদিগন্ত দাপিয়ে বেড়ানো উজবেকদের মনে হঠাৎ বিভ্রম হয়, কী যেন কী হুরিপরির যাদুতে মরুভূমির মাঝে হঠাত এসে গেছে জল... তেমনি, ঐ নীল কাজ করা অদ্ভুত ইমারতগুলোকে দেখলেও মানুষ হকচকিয়ে যাবে, যাবেই। মনে হবে এই হলুদ মরুভূমির মধ্যে কোথা থেকে এল জল! কোথা থেকে এল এত চোখ জুড়নো নীল নীল নীল। এ কী স্বপ্ন, এ কী মায়া! এ কী মরীচিকা!

নাঃ কাছে গেলে দেখা যাবে সব বড় বড় ইমারত, বিরাট বিরাট গম্বুজ আর থাম আর তোরণদ্বার, তার ভেতরের জালের মত বিছিয়ে থাকা দারুণ সব নীল পাথরের ঝিকিমিকি কাজ, এগুলো একটাও স্বপ্ন নয়, সত্যি। একেবারে হাতে ধরে দেখার মত সত্যি।

সেই পথেও আমি গিয়েছিলাম একদিন, তবে মরু শহরের দিকে যেতে তাশখেন্ত থেকে ব্যবহার করেছিলাম রেলগাড়ি। আফ্রাসিয়া নামের সাদা ধবধবে মরালীর মত সেই রেলগাড়ি। বিলাসবহুল।

তরমুখ, খরমুজা আর বাদামে ভরা ছোট ছোট সব স্টল পেরিয়ে সেই সব রেশমি শাল, স্কার্ফ আর মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গাধায় চড়া মূর্তির দোকান। পশরা সাজানোর ভঙ্গিটি যেন অনায়াসে হাজার দু বছর আগের মতই। এ পথে আমি যে গেছি বার বার। মনে হবেই হবে।

পূর্ব জন্মের স্মৃতি জেগে উঠবেই।

লিটল ম্যাগাজিন সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব, গান্ধি সংখ্যা, সম্পাদক : রণজিৎ অধিকারী,
ফ্ল্যাট ১এ, ফার্স্ট ফ্লোর, ৩৮/৯ ভুবনমোহন রায় রোড,
কলকাতা ৭০০০০৮, ফোন : ৯৯৩৩৬৯০৩০৯

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে (২ অক্টোবর ১৮৬৯ - ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮) ‘মহাত্মা’ বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার ১৫০তম জন্মবর্ষ পালন করা হচ্ছে দেশে ও বিদেশে। মার্কসবাদীদের গান্ধিচর্চার ইতিহাস অনেক পুরানো। ‘নন্দন’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও মার্কসবাদী চিন্তাবিদ সৈয়দ শহেদুল্লাহ, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আমাদের প্রয়াত নেতা ও শিক্ষক ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, বিশিষ্ট মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা (বিপান চন্দ, ইরফান হাবিব, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি ইত্যাদি) বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মহাত্মার শক্তি ও সীমাবদ্ধতাকে বিশ্লেষণ করেছেন। ৬৪০ পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটিতে গান্ধিজির নির্বাচিত কিছু লেখার পুনর্মূদ্রণ, নির্বাচিত চিঠিপত্র, বেশ কয়েকজন বিখ্যাত মানুষের লেখার পুনর্মূদ্রণ, কবিতায় গান্ধি, কার্টুনে গান্ধি, নাটক, সাক্ষাৎকার, সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বেশ কয়েকজন মানুষের আলোচনা রয়েছে। লেখাগুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল : রবীন্দ্রনাথ, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্ট্যানলি জোনস, মিলি গ্রাহাম পোলোক, অরুণ গান্ধি, শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় দেব, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, চিত্তব্রত পালিত, প্রভাতকুমার দাস, পবিত্র সরকার, জাহিরুল হাসান, প্রদীপন দাশগুপ্ত, সাধন চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব মাজী, অচিন চক্রবর্তী, কুমার

রানা, নাসিম এ আলম আমিনুল ইসলাম, হিন্দোল ভট্টাচার্য, রাহুল দাশগুপ্ত ইত্যাদিদের লেখাগুলি মনোযোগের দাবি রাখে। আর এস এস-এর রাজনৈতিক শাখা সংগঠন হল বিজেপি। তাদের সরকার আর এস এস-এর ফ্যাসিস্ট এজেন্ডাগুলিকে বাস্তবায়িত কোরে চলেছে। নাথুরাম গডসের মতাদর্শগত উত্তরসূরীরা এখনও ভারত-রাষ্ট্রকে পুরোপুরি দখল করতে না পারলেও, ভারত-রাষ্ট্রকে ফ্যাসিস্ট-রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে না পারলেও, আর এস এস তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। এই বাস্তবে গান্ধির শ্রেণিগত সীমা সম্পর্কে সচেতন থেকেই তার লিবারেল মতামতের অনেক কিছুকেই ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করছেন। তাই সংঘ পরিবার শাসিত ভারতে গান্ধিচর্চার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বিদ্যাসাগর সংখ্যা, শারদীয় ২০১৯, সম্পাদক : তাপস ভৌমিক, পোস্ট অফিস : দেশবন্ধুনগর, ইএ ১/৮ বাগুইআটি, কলকাতা : ৭০০০৫৯, ফোন : ৯৪৩৩৫৩১২২৫

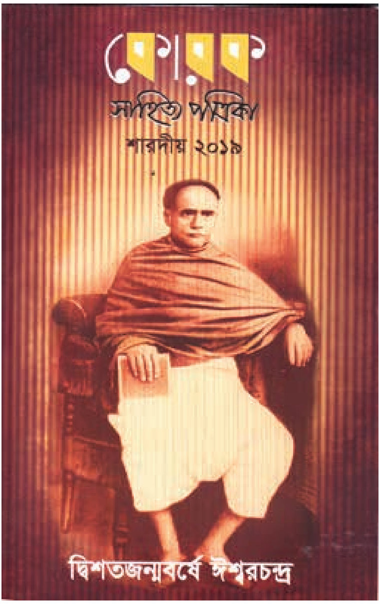

আমরা নন্দনের পাতায় ইতিপূর্বে উজ্জ্বল উদ্ধার ও সংবর্তক-এর বিদ্যাসাগর সংখ্যা বিষয়ে আলোকপাত করেছিলাম। যিনি বঙ্গদেশে একক ছিলেন তার দ্বিজন্মশতবর্ষেও যে তাকে নব নব রূপে আবিষ্কারের প্রয়াস জারী থাকবে লিটল ম্যাগাজিনের জগৎ তা অত্যন্ত দায়িত্ব সহকারে দেখিয়ে দিচ্ছে। কোরক সাহিত্য পত্রিকার বিদ্যাসাগর সংখ্যায় বিভিন্ন দিক থেকে তাকে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের দ্বিশতজন্মবর্ষ উপলক্ষে লিখেছেন :

শ্যামাপ্রসাদ বসু, মাহাবুবুল হক, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, উদয়চাঁদ দাশ, অত্রি মুখোপাধ্যায়। গবেষক ও চরিতকারদের মূল্যায়নের মূল্যায়ন করেছেন : ছন্দা রায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ সইফুল ইসলাম, পিনাকী ভাদুরী, শুভেন্দু সরকার। গদ্যকার বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে লিখেছেন : বারিদবরণ ঘোষ, নির্মাল্য ঘোষ, সৌগত মুখোপাধ্যায়, পল্লব সেনগুপ্ত, আশিস খাস্তগীর, অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য। তার সমসাময়িক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মশায়ের সম্পর্কের মূল্যায়ন করেছেন : পম্পা মুখোপাধ্যায়, গোপা দত্তভৌমিক, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, রামানুজ মুখোপাধ্যায়, অর্ণব নাগ, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়। তাঁর সামাজিক আন্দোলন বিদ্যালয় স্থাপন প্রসঙ্গে লিখেছেন : স্বপন বসু, দিলীপ সাহা, আবীর কর। প্রতিবেশী সাহিত্য ও সমাজে তাঁর প্রভাব ও অবদানের প্রসঙ্গটি খুবই কম আলোচিত। এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন : কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞ্যা, শান্তনু রায়চৌধুরী, সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লব চক্রবর্তী। বিভিন্ন কবিতা, নাটক, চলচ্চিত্রতে বিদ্যাসাগর মশাই কীভাবে এসেছেন তা নিয়ে আলোচনা করেছেন : সুজিত সরকার, গৌরাঙ্গ দন্ডপাত, সন্দীপন বিশ্বাস, নৃপেন চক্রবর্তী। এইসঙ্গে রয়েছে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের লেখার পুনর্মুদ্রণ : হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ গুপ্ত, খন্দকার রেজাউল করিম। এই পুনর্মুদ্রণ অংশে রয়েছে কবীর চৌধুরী রচিত বিদ্যাসাগর মশাই-এর জীবনের কালানুক্রমিক পঞ্জি।

স্বরান্তর, ২০১৯, ‘শেমাস হিনি’ এবং ‘নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও চলচ্চিত্র’ বিষয়ে ক্রোড়পত্র, সম্পাদক : দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক, কল্যাননগর, পানশিলা, কলকাতা ৭০০১১২, ফোন : ৯৪৩২১৬৫১৬৯

স্বরান্তর পত্রিকার এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ হল আইরিশ কবি-নাট্যকার-অনুবাদক শেমাস হিনি-র (১৯৩৯-২০১৩) সাক্ষাৎকার, তার কবিতার ও প্রবন্ধের অনুবাদ। ১৯৯৫-তে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ডেনিশ ও’ড্রিসকল তার যে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন তা অনুবাদ করেছেন অরূপরতন হালদার। তার কবিতাগুচ্ছ অনুবাদ করেছেন রন্তিদেব সরকার ও দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক। তার প্রবন্ধ অনুবাদ করেছেন জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তার

কবিতার বইগুলির মধ্যে রয়েছে : Death of a naturalist (1966), North (1975), District and circle (2006), Human Chain (2011) ইত্যাদি। শেমাস হিনি-র কবিতা ও তার তত্ত্বভাবনাকে সামনে এনে স্বরান্তর পত্রিকা প্রশংসনীয় কাজ করলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও চলচ্চিত্র বিষয়ে ক্রোড়পত্রটি সম্পাদনা করেছেন দেবীপ্রসাদ ঘোষ। এখানে

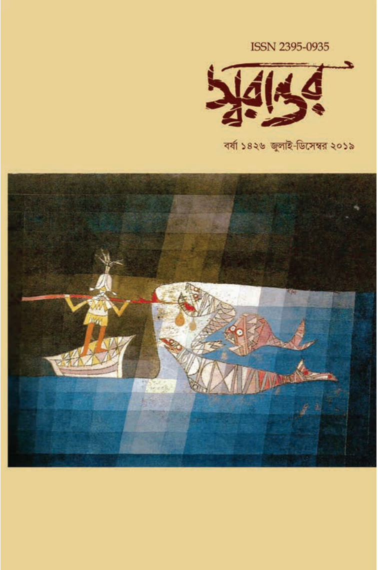

রয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর লেখা তিনটি প্রবন্ধ, দুটি গান, একটি চিত্রকাহিনী ও তার চলচ্চিত্রপঞ্জি। লকডাউনের মধ্যেই চলে গেলেন বাংলা শিল্প-সাহিত্য-জগতের দুই স্তম্ভ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও কথাসিহিত্যিক-প্রাবন্ধিক দেবেশ রায়। স্বরান্তরের বর্তমান সংখ্যায় দুজনারই দুটি লেখা রয়েছে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের লেখাটি হল ১৯৯১ সালে এশিয়াটিক সোসাইটিতে ইন্দিরা গান্ধি স্মারক বক্তৃতা। বিষয় ছিল : সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ। অনুবাদ করেছেন : তাপস গঙ্গোপাধ্যায়। দেবেশ রায়ের দুটি প্রবন্ধের শিরোনাম : 'বিশ্বের বাংলা ও বাংলার বিশ্ব' এবং 'ছোটো পত্রিকা, নতুন লেখা ও অচেনা পাঠক'। প্রবন্ধ লিখেছেন : বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, মৃণাল ঘোষ, অমিত সরকার, শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী। ওকুই এনওয়েজর একসঙ্গে ছিলেন শিল্প-ঐতিহাসিক, কবি ও কিউরেটর। তিনি আফ্রিকাকে তুলে এনেছিলেন বিশ্বের দরবারে। পশ্চিম থেকে নির্মিত নান্দনিক অনুশাসন ও মাপকাঠিগুলিকে সযত্নে পাশে সরিয়ে রেখে অসংখ্য অজানা আফ্রিকান শিল্পীকে বিশ্বের দরবারে এনে শিল্পী হিসেবেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ওকুই এনওয়েজর। ভারতীয় শিল্পকলার ও কিউরেশনের জগতের মানুষদের সঙ্গে তার সংযোগ ছিল। তাঁর প্রয়াণে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন ঐন্দ্রিলা মাইতি সুরাই। কবিতা লিখেছেন : ঐত্রেয়ী সরকার, অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, কৌশিক বাজারী, হিন্দোল ভট্টাচার্য, রাজা হাসান, রবীন্দ্র সরকার। নাটক লিখেছেন মলয় ভৌমিক, ছোটগল্প সরসিজ বসু ও পিন্টু ভৌমিক, ভ্রমন শান্তনু সরকার।

LARGEST EDUCATIONAL CONGLOMERATE OF EASTERN INDIA

#EDUCATIONBEYONDTHEORDINARY

JIS GROUP
Educational Initiatives

Courses Offered

Engineering & Technology
B.Tech, M.Tech,
Diploma Engineering,

Computer Application
BCA, MCA

Pharmacy
B.Pharm, M.Pharm,
D.Pharm, BMLT

Management
BBA-MBA,
BBA, MBA in HR, Marketing,
Finance, IT, Business Analytics,
Media, Travel & Tourism,
Retail, Hospital Management

Law
BBA-LLB, LLB, LLM

Science - UG & PG
Physics, Chemistry,
Geology, Microbiology,
Biotechnology, Genetics
Media Science, Hospitality &
Hotel Administration

Education
B.Ed

Hotel & Hospitality Management and Administration

Ph.D Programmes

INSTITUTIONS	PROGRAMMES	STUDENTS
30	140	37000+

Accreditations, Affiliations and Approval (as Applicable)

NIRF | UGC | MAKAUT (Formerly, WBUT) | AICTE
NAAC | NBA | DCI | PCI
BCI | NCHMCT

ADMISSIONS OPEN 2020 | 90733 70470 | 98308 69988

OUR INSTITUTIONS

JIS University, Agarpara, Kolkata
www.jisuniversity.ac.in
86977 43361

JIS Institute of Advanced Studies & Research, Kolkata
www.jisiasr.org | 98743 75544

JIS College of Engineering, Kalyani
www.jiscollege.ac.in | 94320 11490

Narula Institute of Technology Agarpara, Kolkata
www.nit.ac.in | 89024 96650

Guru Nanak Institute of Technology Sodepur, Kolkata
www.gnit.ac.in | 94320 12681

Dr. Sudhir Chandra Sur Degree Engineering College, Dum Dum, Kolkata
www.dsec.ac.in | 94320 11483

Guru Nanak Institute of Pharmaceutical Science & Technology, Sodepur, Kolkata
www.gnipst-pc.ac.in | 89024 96653

Asansol Engineering College (JV), Asansol
www.aecwb.edu.in | 90736 83912

Abacus Institute of Engineering and Management (JV), Mogra
www.abacusinstitute.org | 90736 83913

Greater Kolkata College of Engineering and Management (JV), Baruipur
www.gkcem.ac.in | 90736 83914

JIS School of Polytechnic, Kalyani
www.jissp.ac.in | 82407 66831

Guru Nanak Institute of Hotel Management, Sodepur, Kolkata
www.gnihm.ac.in | 98961 06964

OUR MAJOR RECRUITERS

TATA CONSULTANCY SERVICES | JK TYRE | Tech Mahindra | Capgemini | Cipla | IBM | LARSEN & TOUBRO
hp | genpact | cisco | Cognizant | amazon | SIMPLEX INFRASTRUCTURES LTD | Infosys ...many more

Corporate Office: Dwarka Building, 1st Floor, 7 Sarat Bose Road, Kolkata - 700 020
/JISGROUPEDUCATIONALINITIATIVES | www.jisgroup.org

নিউ-টাউনে নিজস্ব বা কো-অপারেটিভ বাড়ি বানাতে চান ?
পছন্দসই সুন্দর ডিজাইন চান ? খুঁতহীন সঠিক গুণমান চান ?
নিশ্চয়ই ঠকতে চান না ? কষ্টার্জিত অর্থের অপব্যয় চান না ?
তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করুন
নিকেতনী
সি এল – ১২৪, সল্ট লেক
কলকাতা – ৭০০০৯১
NIKETANEE
CL-124, SALT LAKE,
KOLKATA - 700091
Phone : 9123093442, 9331034638, 8420568067
Email : niketanee@gmail.com
Our Quality : Your Satisfaction || Our Satisfaction : Your Comfort
Our Performance : Maximum Value for your Budget
Our Success : Your Delightment || Our Pride : Honesty & Integrity
Our Wealth : 22 yr's Experience & so many satisfied clients